আমার নাম
কালাপাহাড়

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

বিশ্বনাথ ঘোষ

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১১ই কার্তিক ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স
১নং ছিদামমুদি লেন,
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

শ্রীমতী দেবিকা ঘোষ

…ইতিহাস, কিংবদন্তি আর কল্পনা দিয়ে গড়া এক নায়ক যার নাম কালাপাহাড়। উদ্দাম গতিতে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়ায় এক জীবন্ত বিভীষিকা। হিন্দুদের দ্বারা বিতাড়িত পাণ্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে কালাচাঁদ মুসলমান হয়ে চরম প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছিল। নিদারুণ পাপের নিষ্করুণ পরিণতির এক অসাধারণ ঐতিহাসিক দলিল।

গ্রন্থকারের অন্যান্য উপন্যাস

ক্লিন্ন ধরিত্রী

পৃথিবী বিশাল

তারারা তিমির নয়

বৃষ্টির পর বন্যা

॥ এক ॥

দেবতাত্মা হিমালয়। যেন পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন নিমীলিত নেত্রে-তপঃক্লিষ্ট এক যোগীপুরুষ। পূর্বহিমালয়ের হিমবাহ থেকে দার্জিলিং জেলার বুক চিরে দক্ষিণমুখী হয়ে বিসর্পিল গতিতে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে অপরূপা মহানন্দা। কে জানে কোন্ এক অজানা আকর্ষণে, কি এক অচিন পথের টানে মহানন্দার ফেনিল জলরাশি উদ্দাম গতিতে দুরিতহারিণী গঙ্গার দিকে ছুটে চলেছে। আজকের শেওলাধরা, রুদ্ধস্রোত, মন্দাক্রান্তা মহানন্দা নয়—ষোড়শ শতকের উদ্ভিন্ন যৌবনা প্রাণচঞ্চলা মহানন্দা। অনেক কান্নাহাসির, অনেক বিরহ মিলনের, অনেক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী সে। অসংখ্য ভাঙ্গা-গড়ার বিচিত্র কাহিনী ঘটেছে তার কূলে। একদা তার তীরে যে মহাজীবনের জাগরণ হয়েছিল, যে রূপসী রাজনন্দিনীর অমর প্রেম শতশিখায় বহ্নিমান হয়ে তামাম হিন্দুস্থানকে ভস্মীভূত করে দিয়েছিল, যে বিয়োগান্ত নাটকের নিষ্করুণ অভিনয় ঘটেছিল সে কথা ভেবে বেদনার্ত মহানন্দা আজও অশ্রুসজল। তার সর্পিল স্রোতের অন্তঃপ্রবাহে কত মানুষ ভেসে গেছে, কত অনাঘ্রাত যৌবনের নীরব কান্না তার ঘূর্ণিস্রোতে ডুবে মরেছে, কত বরনারীর নূপুর নিক্কণ তার নৈশ তটভূমিকে মন্দ্রিত করেছে, কে তার খবর রাখে? কেউ জানে না, কালো ঘোড়সওয়ারের ঘোড়ার খুরের শব্দে কতো বিদ্যুৎ চকিতে ঝল্‌কে উঠে নিভে গেছে। আজও বর্ষণমুখর নিশীথরাত্রে নিস্তরঙ্গ মহানন্দার তীরে তীরে এক অতৃপ্ত, বিদেহী আত্মার গুমরে ওঠা কান্না শোনা যায়। আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে, আকাশের নীচে মানুষ

কাঁদে। এখনও অকস্মাৎ চন্দ্রালোকিত কুয়াশাচ্ছন্ন নিঝুম রাত্রে নিঃসঙ্গ পথিক এক অশরীরী নারীমূর্তিকে নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে সতীঘাটে এসে বিলীন হতে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। বর্ষণমুখর গভীর রাত্রে এক ভৌতিক আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে শিশু ভয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে। কোন এক অপদেবতার অনুশোচনার অনুচ্চারিত দীর্ঘশ্বাসের শব্দে মহানন্দার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মহানন্দা আজও কাঁদে।

এই সেই মহানন্দা। দুলারীকে বুকে নিয়ে আজও সে বহে চলেছে। আজও সে কেঁদে চলেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আমরা মহানন্দার কূলে ফিরে যাবো। অন্ধকারে অবলুপ্ত এক ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠবে।

হে অতীত কথা কও। অতীত কথা বলবে। ইতিহাস কাহিনী লিখবে। আমরা দেখব মহানন্দার তীর ও তরঙ্গ। তার দেহ ও দাহ।

* * *

পৌণ্ড্রবর্ধন ও কোচ এই দুই রাজ্যের সীমান্ত চিহ্নিত করে দিয়েছে মহানন্দা। পৌণ্ড্রবর্ধন পোদজাতির রাজ্য। তাদের রাজধানী মহাস্থান। মহানন্দার অপর তীরে কোচ বা রাজবংশী রাজ্য। রাজধানীর নাম কোচবিহার। শিলিগুড়ি থেকে কিছু ওপরে মহানন্দা জলপাইগুড়িকে স্পর্শ করে নৃত্যপরা নারীর মত আঁকাবাঁকা ভঙ্গীতে স্ফীতকায়া হয়ে পূর্ণিয়া ও তিতালিয়ার মধ্যে দিয়ে বহে গেছে। মহানন্দার তীরে কিষাণগঞ্জ ও বারসোই নামে দুটি বড় গঞ্জ গড়ে উঠেছে। বড় বড় পণ্যবাহী তরী এসে সেখানে নোঙর করে। এরপর মহানন্দা মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে এবং দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। হিমালয়ের পার্বত্য উৎস থেকে দুশো ছাপান্ন মাইল প্রবাহিত হয়ে অবশেষে মহানন্দা গঙ্গায়

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পতিতপাবনী জরিতহারিণী গঙ্গা।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড় নগরীর পত্তন করেছিলেন। নিজের নামেই এর নামকরণ করেন লক্ষ্মণাবতী। লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামেই সমধিক পরিচিত। তাল-তমাল আর খেঁজুর গাছে ভর্তি এই অঞ্চল। এখানকার প্রধান কুটিরশিল্প ছিল তাল আর খেজুরের গুড়। গুড় থেকে গৌড়।

আফগান ভাগ্যান্বেষী বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় বাংলার ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। এক মসীলিপ্ত কাহিনী। বখতিয়ার খিলজী বিনাযুদ্ধে, খাপ থেকে তরবারী বার না করেই বৃদ্ধ ও অপদার্থ রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করেন। ভোজনপ্রিয় লক্ষ্মণসেন দুপুঃবেলা আহারে বসেছিলেন। সংবাদ এলো বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাঠান নবদ্বীপ আক্রমণ করেছে। মুসলমান নগরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বাঁচতে হলে পালাতে হবে। যঃ পলায়তি স জীবতি। সংবাদের সত্যতা যাচাই না করেই ভীত এবং কাপুরুষ রাজা খিড়কী দরজা দিয়ে সপরিবারে চোরের মত রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করলেন। নবদ্বীপ থেকে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান পরে তিনি গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ১৩৫০ সালে আর এক দুঃসাহসী যোদ্ধা সামসুদ্দিন ইলিয়াস পাণ্ডুয়াতে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এর সত্তর বছর পরে জালালউদ্দিন পুনরায় গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন।

এক স্থান থেকে অপর একস্থানে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া মুসলমান রাজাদের কাছে একটা কৌতুকের ব্যাপার ছিল। ছিল এক মজার খেলা। সুলতান সুলেমান কররানি বাহুবলে বাংলাদেশ জয় করলেন কিন্তু সমৃদ্ধশালী রাজধানী গৌড়কে পছন্দ করলেন না। হিন্দুর ঐতিহ্য ও স্থাপত্যকীর্তিতে ভরা এ নগরী গৌড়া মুসলমানের রাজধানী হতে পারে না। কররানি আফগান বীর, কাবুলের পার্বত্য উপত্যকা থেকে একটার পর একটা দেশ জয় করে

ঝড়ের বেগে অবশেষে সমতল বাংলায় এসে থামলেন। হুসেন শাহকে বিতাড়িত করে বাংলা ও বিহারে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু রাজধানী গৌড় তাঁর অপছন্দ।

মনের মত একটা নগর চাই। ছবির মত রাজধানী চাই। ফেলে আসা স্বদেশের কথা বারে বারে মনে পড়ে সুলতানের। আখরোট আর পেস্তাবাদামে ভর্তি বাগিচা। তার তীরে ছোট গ্রাম, চিস্তি, যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাবুল নদী। স্বদেশের কথা মনে পড়লেই সুলতানের মন উদাস হয়ে যায়। এমন একটা স্থান কি খুঁজে পাওয়া যাবে না যা সুলতানকে ভুলিয়ে দেবে হারিয়ে যাওয়া স্বদেশের স্মৃতি? এমন একটা গ্রাম কি খুঁজে পাওয়া যাবে না যার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে কাবুল নদীর মত একটা প্রমত্ত পাহাড়ী নদী? আরবি ঘোড়ায় চড়ে রাজ্যের সীমান্ত পরিদর্শনে গিয়ে সুলতানের চোখে পড়ল মহানন্দার তীরে একটা ছোট্ট হিন্দু গ্রাম। তন্দা। গৌড়ের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তন্দা। অদ্ভুতভাবে সুলতানের পছন্দ হল গ্রামটি। এমনটিই তিনি খুঁজছিলেন। তাল, তমাল আর হিজলের ছায়াবেষ্টিত গ্রাম। পথের দুপাশে গুবাক তরুর সারি। পাশ দিয়ে বহে গেছে কাবুল নদীর মতন একটা ছোট নদী—মহানন্দা। মহানন্দার তীরে ছায়াঘেরা এই পল্লীটিই রাজনগরে রূপান্তরিত হবে। তাঁর রাজধানী হবে। ফরমান জারি হয়ে গেল। স্থপতিদের ডাক দেওয়া হল। বান্দা ও ক্রীতদাসদের হুকুম করা হল। নূতন করে নগর তৈরী করতে হবে। প্রথমেই এই গ্রামকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার। সুলতান সৈন্যদের আদেশ দিলেন। ভেঙ্গে গুড়িয়ে দাও গ্রাম। ধ্বংসের নিষ্ঠুর উল্লাসে মেতে উঠল মুসলমান খান সেনার দল। সাতদিন ধরে চলল অগ্নিকাণ্ড। ভস্মীভূত হল জনপদ। ধূলিস্মাৎ হল দেবদেউল, নিশ্চিহ্ন হল হিন্দুর প্রান্ত-পরিখা। ওই ধ্বংসস্তূপের ওপর পত্তন হল সুলতানের নূতন মুসলমানী রাজধানী তন্দা। আনন্দ-স্ফূর্তিও

শরাবের নগর গড়ে উঠল। লক্ষ্ণৌ থেকে পাঁচশো সুকণ্ঠী বাইজী এলো। বারাণসী থেকে কেলিকলাপারঙ্গমা কয়েক শো বারাঙ্গনা এলো। ইরাণ থেকে এলো রূপসী রতিরঙ্গিনী নর্তকীর দল। মুজরো বসল। মাইফেল চলল।

বণিক এলো, ধনিক এলো, বেসাতিদার এল। মসলা আর তামাক বোম্বাই পণ্যজাহাজ নিয়ে এল পর্তুগীজ ফেরেববাজের দল। পারস্য গালিচা আর আরবী কিংখাব নিয়ে এল আলখাল্লাপরা আরব সওদাগরের দল। বিরাট সব বাজার বসল। বাজারে বণিক আর বিলাসী নাগরিকের ভীড় জমল। পণ্য বাজারের পাশে গড়ে উঠল বাঁদী বাজার। পণ্যসামগ্রীর সওদার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে থাকল আরবদের আনা বাঁদী আর কাফ্রি খোজার বিকিকিনি। সেই সঙ্গে দুটো একটা নীলচোখ পণ্য বেদুইন ইরাণী। রাতের অন্ধকারে পণ্যবাহী জাহাজ লুঠের আশায় হার্মাদ আর মগ জলদস্যুদের ছিপগুলো তীরের গতিতে মহানন্দার উপর দিয়ে ছুটে যেতে দেখা যেত।

সুলতানের সঙ্গে নফর এলো। বান্দাবাঁদী এলো। হাবসী খোজা এল। মোসাহেব চাটুকার এলো। এল পারিষদবর্গ— আমীর ওমরাহের দল। আর এদের সঙ্গে এলো মধুলোভী ভাগ্যান্বেষী ধর্মান্তরিত উচ্ছিষ্টলোভী হিন্দুর দল। নগরে একটার পর একটা অভ্রংলিহ প্রাসাদ গড়ে উঠল। দরগার পাশে মোক্তাব হল। গড়ে উঠল আগামঞ্জিল। মন্দির ভেঙ্গে তার ওপর মাথা তুলল জুম্মা মসজিদ। দরগা আর ঈদগায় ভরে গেল নগর। দেবালয় মসজিদের চারমিনারে রূপান্তরিত হল। সায়ংকালে অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মিটা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগেই মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর ইথারের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হল…

লা আল্লা ইলল্লা মহম্মদ উর রসুলাল্লা…

সুলতান প্রথমে রাজধানীর একটা ইসলামী নামকরণের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি সে চিন্তা পরিত্যাগ করেন। তন্দা নামটি মন্দ নয়। থাক ওটা। পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাবিহারের রাজধানী তন্দা এক সম্পদশালী নগরী ও জীবন্ত জনপদে রূপান্তরিত হয়ে গেল যেন কোন এক যাদুমন্ত্রবলে।

সুলেমান কররানি শুধুমাত্র একজন দুর্দ্ধর্ষ অকুতোভয় যোদ্ধাই ছিলেন না—তিনি একজন ধর্মোন্মাদ প্রকৃতির ব্যক্তিও ছিলেন। সে যুগ ছিল ধর্মান্ধতার যুগ—ধর্মান্তরকরণের যুগ। এক হাতে নাঙ্গা তলোয়ার আর অন্য হাতে আলকোরাণ নিয়ে ইসলামের জয়ধ্বজা ওড়ানোর দিন। পুতুল পুজোর অবসান ঘটিয়ে, কুসংস্কারের কুয়াশা ছিন্ন করে নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার স্বর্ণযুগ। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হবে হজরৎ মহম্মদ-দারুল-ই-ইসলামের নাম—প্রতিষ্ঠিত হবে কোরাণের ঐশী বাণী—লা আল্লা ইলল্লা মহম্মদ উর রসুলাল্লা।

সোলেমানের ফুটন্ত রক্ত নেচে ওঠে কোরাণের সুরার সঙ্গে। ইসলামকে প্রচার কর। ইসলামকে প্রসার কর। ইসলামকে বিস্তার কর। পবিত্র কোরাণকে প্রতিষ্ঠা কর। চূর্ণ করে দাও পৌত্তলিকতা। দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দাও অবিশ্বাসী কাফেরের দল। সাচ্চা ইমানদার মুসলমানের মত সুলেমান জেহাদে নেমে পড়লেন। ছল-বল-কৌশল প্রয়োগ করে যত অবিশ্বাসী কাফেরকে পারলেন ধর্মান্তরিত করলেন। হিন্দুদের ডেকে বললেন, মুসলমান হও, রাজদরবারে চাকুরী পাবে। কৃষকদের ডেকে বললেন, মুসলমান হও, নিষ্কর জমি পাবে। ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন কলমা পড়, রূপেয়া পাবে, রাজসম্মান পাবে। গ্রামের পর গ্রাম হিন্দুশূন্য হয়ে উঠল। রাজরোষে পুড়ে গেল কত শত গ্রাম। বন্দী হয়ে বান্দা হল অসহায় মানুষের দল। সুলেমান অবশ্য মন্দির অপবিত্র করলেন না, কালাপাহাড়ের মত বাঁহাত দিয়ে দেবমূর্তি

চূর্ণ করলেন না কিন্তু হিন্দুর পূজা-অর্চনা করা অসম্ভব করে তুললেন। ঢাকঢোল বাজানো চলবে না। কাঁসর-ঘণ্টা নিষিদ্ধ হল। মসজিদের এক হাজার গজের মধ্যে কোন হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধমঠ থাকবে না। অতএব মন্দিরে তালা পড়ল। দেবদেউলের চূড়া ভেঙ্গে পড়ল। সংস্কারের অভাবে খসে পড়ল দেওয়াল। সোলেমানের নিষ্ঠুর নির্মম হিন্দুবিদ্বেষ পরিতৃপ্ত হল। তাঁর লৌহ-কঠিন শাসনে, রক্ত ও তরবারির আস্ফালনে স্তব্ধ হয়ে গেল বৈদান্তিক বিবেক। হিন্দুরা দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিক হয়ে প্রাণে বেঁচে রইল কোনমতে।

সেটা রাজতন্ত্রের যুগ। স্বৈরাচারী সোলেমান ছিলেন সুরামত্ত, নারীপ্রিয়, গোঁড়া মুসলমান। একশত পঁচিশটি যুবতী নারী এনে তিনি তাঁর হারেম পূর্ণ করেছিলেন। সুন্দরী যুবতী হলে তার কোন পরিত্রাণ নেই। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বিবাহিতা হোক, অবিবাহিতা হোক, সধবা হোক, বিধবা হোক, সোলেমানের মত্ত লালসা থেকে তার নিস্তার নেই। হিন্দু নারীর সতীত্ব হরণে সুলতান এক বিজাতীয় আনন্দ উপভোগ করতেন। বিবাহিতা নারীর উপর তার চোখ পড়লে তিনি তার স্বামীকে হত্যা করে বিধবাকে হারেমে নিয়ে এসেছেন। অবিবাহিত: হলে মেয়ের বাবাকে রূপেয়া দিয়েছেন। রাজী না হলে বাবাকে খতম করে মেয়েকে ধরে এনে হারেমে পুরেছেন। রাক্ষস বিবাহ বীরের বিবাহ। নারী বীরভোগ্যা। এইভাবে সুলতান এক এক করে একশত পঁচিশটি সুন্দরী যুবতী নারী দ্বারা তাঁর হারেম পূর্ণ করেছেন। এদের সকলকে তিনি বিবাহ করেন নি, বেগমের মর্যাদা দেন নি; কিন্তু প্রত্যেক নারীকেই সুলতানের জৈব কামনা মেটাতে হয়েছে। নারীকে ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর অন্য কিছু বলে মনে করেন নি সুলতান। কোন দিন তাদের মন খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন নি তিনি। প্রেম করার মত সময় বা ধৈর্য তাঁর নেই। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মতন সংবেদনশীল মন তার নেই।

সুরা, সাকী আর সম্ভোগ। জীবনে এর বেশী কিছু সুলতানের চাওয়া নেই। সোলেমানের হারেমে যত যুবতী নারী ছিল তাদের মধ্যে সুলতানের সবচেয়ে প্রিয় ছিল জাকিয়া বেগম।

জাকিয়া বেগম। পিতৃদত্ত নাম বিজয়লক্ষ্মী।

মধুরায় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৌড়ের এক গ্রামে বাস করতেন। সুলেমান একদা অশ্বারোহণে গৌড়ের পথ দিয়ে তন্দায় প্রত্যাবর্তনের সময় দেখলেন মঙ্গলেশ্বর মন্দির থেকে পূজা দিয়ে থালা হাতে ফিরছে এক বর্ষিয়সী রমণী। সঙ্গে এক অপরূপ লাবণ্যবতী উদ্ভিন্ন যৌবনা কান্তা কন্যা। ছায়াচ্ছন্ন ঘনায়মান সন্ধ্যায় সুলতানের মনে হল এ যেন এক জীবন্ত আলোকশিখা। এ কোন বেহেস্তের হুরী? কোন আসমানের পরী?

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতেই ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। সোলেমানের সুপ্ত কামনা রূপের আগুনে লেলিহান হয়ে উঠল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন তিনি। অঙ্গুলি নির্দেশ করে সিপাহ-শালারকে বললেন, এদের অনুসরণ কর। খোঁজ নাও, এ কার মেয়ে।

—জাঁহাপনা এ কোন হিন্দুর কন্যা হবে।

অস্ফুটস্বরে সেনাপতি বললেন।

সেনাপতির মূর্খতা দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন সুলতান।

হিন্দু মন্দিরে কোন মুসলমান নারী পূজা দেয় না, এ আমি জানি রহিম খাঁ। আমি জানতে চেয়েছি মেয়েটির বাবা কে। খোঁজ নাও। আমি এখানেই তাঁবু ফেললাম। মাল না নিয়ে যাব না।

—যো হুকুম জাঁহাপনা।

সেনাপতি মেয়েদের অনুসরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি খবর নিয়ে এলেন। মেয়ের নাম বিজয়লক্ষ্মী—বাবার নাম মধু রায়। অতি দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ কিন্তু অত্যন্ত লোভী, হীন এবং অসৎ।

সুলেমান মধু রায়কে ডেকে পাঠালেন।

ভীত মধু রায় গলবস্ত্র হয়ে এসে হাজির হল।

—আমাকে তলব করেছেন হুজুর? সুলতানকে কুর্নিশ করে নিবেদন করল।

—হ্যাঁ। আপ্যায়ন করলেন সুলতান।

কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করে সুলতান আসল কথাটা পাড়লেন। সোজাসুজি বললেন, তিনি তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী। পরিবর্তে সুলতান তাকে প্রভূত ধনরত্ন দেবার, আমীরের মর্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কি পরিণাম হবে তার ইঙ্গিতও মধু রায় পেল। তাছাড়া এত অর্থ ও রাজসম্মানের কথা ভেবে মধু রায়ের জিবে জল এসে গেল। চোখ ড্যাব ড্যাব করল। ভাগ্য ফেরাবার এই মহৎ সুযোগ হাতছাড়া করলে সারাজীবন পস্তাতে হবে। দ্বিরুক্তি না করে তিনি রাজী হয়ে গেলেন আর বিজয়লক্ষ্মী জাকিয়া বেগম হয়ে সোলেমানের হারেমে প্রবেশ করলেন।

পরমাসুন্দরী জাকিয়া বেগম অত্যন্ত ধীর, স্থির এবং নম্র স্বভাবের রমণী। তিনি হিন্দু-সতীনারীর নিষ্ঠা নিয়ে স্বামীকে ভালবাসতেন, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে তার উন্মত্ত লালসা মেটাতেন। সোলেমানের প্রধান বেগম হলেন তিনি। জাকিয়া বেগম যথাসময়ে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার জন্ম দিল

তুলারী। বেহেস্তের ফেরিস্তা। স্বর্গের অপ্সরীও তার কাছে হার মানে। তিল তিল করে সৌন্দর্য দিয়ে তৈরী এক তিলোত্তমা। এক অঙ্গে এত রূপ ভাবলেও বিস্ময় লাগে। দেবশিশু। যে দেখে সে আর চোখ ফেরাতে পারে না। চোখ ফেরাতে পারে না সোলেমান।তার নিজের সৃষ্টি দেখে সে বিভোর হয়ে যায়। মা-বাবার নয়নের মণি হয়ে উঠল তুলারী। তুলারীর জন্মের পর সহসা সুলেমানের জীবনের পালাবদল হতে থাকে। তার আশ্চর্য এক

মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ধর্মোন্মাদনা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কাফেরদের প্রতি তিনি অনেক বেশী ধৈর্যশীল হলেন। অনেক বেশী উদার হলেন। এমনকি সৈন্যবাহিনীতে তিনি হিন্দু নিয়োগ করতে শুরু করলেন। বিচারের সময় তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ করতেন না। নবচেতনায় উদ্ভাষিত হতে থাকে সুলেমান। এ দেশে বাস করতে হলে, এ দেশে রাজত্ব করতে হলে হিন্দুদের উপেক্ষা করলে চলবে কেন?

চাকুরী পেতে হলে রাজার দরবারে যেতে হবে। রাজধানী গিয়ে আর্জি পেশ করতে হবে। উত্তরের ভাদুড়িয়া রাজ্য থেকে এক নবীন সুদর্শন, বীরভূঁইয়া ব্রাহ্মণ তন্দায় এসে উপস্থিত হল চাকুরীর সন্ধানে। পেশীবহুল দেহ; তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ক্ষুরধার বুদ্ধি। যুবকের নাম নয়নচাঁদ রায় ভাদুড়ী। প্রার্থীর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে সুলেমান প্রীত হয়ে তাকে সৈন্যদলে নিয়োগ করলেন। অতি সত্বর নিজ যোগ্যতা প্রদর্শন করে, বীরত্ব দেখিয়ে একনিষ্ঠা প্রমাণ করে ফৌজদারের পদে উন্নীত হলেন নয়নচাঁদ। নয়নচাঁদ স্ত্রী বন্দনাদেবী ও শিশুপুত্র কালাচাঁদকে নিয়ে তন্দ্রায় বাস করতে শুরু করেন।

দুলারীর জন্মের কয়েক বছর পর জাকিয়া বেগমের গর্ভে সুলতানের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিয়াজিদ ও দায়ুদ খাঁন। পুত্র-কন্যা নিয়ে সোলেমানের পারিবারিক জীবন অত্যন্ত শান্তিময় হয়ে উঠলেও, ধর্মোন্মাদনা কমলেও, পার্থিব লোভ তাঁর বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি।

সোলেমান কাররানি ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তাঁর উচ্চাকাংখার কাছে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও বিহার যথেষ্ট ছিল না। রাজ্য বিস্তার করতে হবে। নূতন নূতন দেশ জয় করতে হবে। রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য। সসাগরা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার স্বপ্ন দেখতেন সুলতান। তাঁর লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দক্ষিণে। দেখলেন

দেবদাসীভর্তি উড়িষ্যার আশ্চর্য দেবদেউল। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতান উড়িষ্যা অভিযান করলেন। কিন্তু রাজা মুকুন্দদেব সেই অভিযান ব্যর্থ করে দিলেন: সোলেমানের সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। নির্মম পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে সোলেমান নতমস্তকে সেদিন ফিরে এলেন তন্দায়। কিন্তু কেন এই পরাজয়? আফগানিস্তানের পার্বত্য উপত্যকা থেকে একটার পর একটা দেশ জয় করে বাধাহীন ঝড়ের উদ্দাম গতিতে এগিয়ে গেছেন সুলতান। সামনের সব বাধা তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেছে। শেষকালে কিনা এক সামান্য মদ্রদেশীয় ব্রাহ্মণের হাতে এই নিদারুণ পরাজয়। আজ হোক, কাল হোক উৎকল জয় করতেই হবে সুলতান পুনরায় উড়িষ্যা আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

নিরুত্তাপ মহানন্দা বিড়ম্বিত সুলতানের ভাগ্যের উত্থানপতন দেখে নীরবে বহে চলে।

যাদের চোখ আছে তারা দেখে। যাদের কান আছে তারা শোনে। মহানন্দা কথা বলে। দুলারী মহানন্দার কথা শোনে। মহানন্দার সঙ্গে এক বিচিত্র সখ্যতা গড়ে ওঠে দুলারীর। নদীর কুলুধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুণগুণ করে গান গায় দুলারী। মানুষের সঙ্গতার চেয়ে নদীর শীতল জলের আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশী লোভনীয়। মহানন্দার তীরে গড়ে উঠেছে নবাব-প্রাসাদ। দুলারী তার কক্ষ থেকে মহানন্দার মনোমুগ্ধকর অপরূপ রূপ দেখে। মহানন্দা তার কাছে এক অবগুণ্ঠনবতী নারীর মত রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দুলারীর মনে হয় হাজার বছর ধরে মহানন্দার কূলে বসে তার রূপ দেখলেও তার অতৃপ্তি থেকে যাবে। প্রাসাদের রাজকীয় প্রাচুর্যে যখন দুলারী হাঁপিয়ে ওঠে তখন সে ছুটে যায় নদীর কাছে। মহানন্দার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে নিজের মনে কি সব কথা বলে। জলে পা ডুবিয়ে অকারণে চুপ করে বসে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে সখীরা এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। দুলারীর মত

বয়স বাড়তে থাকে মহানন্দার আকর্ষণ তার কাছে তত তীব্র হতে থাকে। সন্ধ্যার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। বজরায় বসে বসে দুলারী মহানন্দার স্বচ্ছ নীলাভ জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকে। অকারণে তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে মহানন্দার জলরাশিতে মিশে যায় অকারণে দুলারী কাঁদে। মহানন্দাও কি কাঁদে?

মহানন্দার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুলারীর সতেরোটি বসন্ত কেটে গেছে। মহানন্দা ছাড়া দুলারী মনের কথা বলার আর কাউকে পায় নি। মনের মানুষ কি সত্যি পাওয়া যায়? দুলারীর জীবনে এক রহস্যঘন আকর্ষণের আবর্ত রচনা করে বহে চলে মহানন্দা। মহানন্দার আছে এক অলৌকিক আকর্ষণ।

দুলারী জানে না কখন এই মহানন্দা তার জীবনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। গভীর রাত্রে মহানন্দার জলচ্ছ্বাসে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে দুলারীর। নিঃশব্দে পালঙ্ক থেকে উঠে দুলারী প্রাসাদ অলিন্দে এসে মহানন্দার দিকে চেয়ে বসে থাকে। সুলতানের একমাত্র কন্যা। আব্বাজান আর আম্মাজানের আদর আর সোহাগে সে ডুবে আছে। জড়োয়া গহনা, ঢাকাই মসলিন আর বেনারসী শাড়ীর তার পাহাড়। রেশমী ওড়না আর জরির নাগরাই জুতোয় ঘর ভর্তি। দশজন সহচরী সর্বদাই তার পরিচর্যার জন্যে, তার দেখাশুনা করার জন্যে ছায়ার মত তার পিছনে পিছনে ঘুরছে। হুকুম করা মাত্রই হাবসী খোজা তার পছন্দ মোতাবেক দ্রব্য এনে হাজির করে। কিন্তু তবুও মনের দিক থেকে দুলারী নিঃসঙ্গ। সব থেকেও কি যেন তার নেই। সে নিজেই জানে না কি তার নেই। যা নেই সে কি তার মনের মানুষ? মহানন্দার মধ্যে কি সে তার মনের মানুষ খুঁজে পায়? বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতায় যখন জীবন দুঃসহ হয়ে উঠত তখনই দুলারী ছুটে যেত মহানন্দার কাছে। তার সঙ্গে অস্ফুট স্বরে কি সব বলত। কখন কলকণ্ঠে হেসে উঠত, কখন বা অভিমানে

কেটে পড়ত। নদীর জলপ্রবাহের মধ্যে সে সব অশরীরী আত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেত। একদিন এই মহানন্দাই তার জীবনের সব জ্বালা শীতল করে দেবে বলেই কি দুলারী তার কাছে বার বার ছুটে যেত? গোপনে শলাপরামর্শ করত?

সতেরোটা বছর কেটে গেছে। মহানন্দার অনেক জল গঙ্গা দিয়ে বহে সাগরে মিশেছে। পৃথিবীর অনেক রং বদলেছে। সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ফৌজদার নয়নচাঁদ মারা গেছেন। তাঁর পুত্র কাঁলাচাদ রায় ভাদুড়ি সুলতানের সৈন্যদলে সামান্য সিপাহী হিসাবে যোগদান করে অতি সত্তর নিজ যোগ্যতায় পদোন্নতি করেছে।

নয়নচাঁদ যখন মারা গেলেন তখন তাঁর স্ত্রী বন্দনাদেবী সতী হবার বাসনা প্রকাশ করেন। গ্রামের সব লোকেরা তাঁর প্রশংসায় ধন্য ধন্য করে উঠল। এই গ্রামে একজনও সতী নেই। পুরোহিতেরা গ্রামের পূজামণ্ডপে সমবেত হয়ে বলতে লাগল, 'পুড়বে নারী, উড়বে ছাই, তবে তো নারীর গুণ গাই।' এ সংবাদ পেয়ে তড়িৎগতিতে ছুটে এলেন বন্দনার পিতা মাধব রায়।

—এসব কি শুনছি?

—আমি সতী হব বাবা।

—না। এ হতে পারে না।

—কেন হতে পারে না বাবা?

—তোমার নাবালক পুত্র রাজুকে দেখবে কে? আর পুত্রবতী জননীর সতী হবার কোন বিধান নেই শাস্ত্রে।

শেষ পর্যন্ত মাধব রায়ের অনুরোধে আর, নাবালক কাঁলাচাদের কথা ভেবে বন্দনাদেবীর সহমরণ করা হল না।

নয়নচাঁদের পরিবার ছিল শৈব কিন্তু মাতৃকুল ছিল পরম বৈষ্ণব। কিন্তু কালক্রমে নয়নচাঁদের পিতৃপুরুষও বৈষ্ণব হয়ে যায়। কালাচাঁদের পিতামহ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কালাচাঁদকে বৈষ্ণব ধর্মমতে

দীক্ষিত করে বড় করে তুলতে থাকেন।

ডাকনাম রাজু। ভালো নাম কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ি। বৈদান্তিক ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা আর পরম বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কালাচাঁদ বড় হতে থাকে। সংস্কৃত দেবভাষা। সংস্কৃত না জানলে পূর্ণ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। কালাচাঁদ গৌড়ে সায়নাচার্যের টোলে গিয়ে সংস্কৃত শিখলেন। পানিনি কণ্ঠস্থ করলেন। চতুর্বেদ অধ্যয়ন করলেন। অষ্টাদশ পুরাণ অধিগত করলেন। জ্যোতিষ রপ্ত করলেন। উৎসাহ সহকারে ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। উদাত্ত কণ্ঠে বৈদান্তিক মন্ত্র আবৃত্তি করে সকাল-সন্ধ্যা বিষ্ণুর পূজা করতেন। উদীয়মান যুবক কালাচাঁদের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের কথা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। নবদ্বীপে কয়েকটি ধর্মালোচনায় যোগ দিয়ে কালাচাঁদ বেদান্তের নব নব ব্যাখ্যা দিলেন। কালাচাঁদের খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। লোকে বলাবলি করতে শুরু করে, বয়সে নবীন হলে কি হবে, মাথাটা জ্ঞানবৃদ্ধের। অধঃপতিত জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে। হিন্দুর গৌরব বৃদ্ধি করবে। কুলং পবিত্র, জননী কৃতার্থা।

কালাচাঁদের বয়স যখন সতেরো তখন বৃদ্ধ পিতামহ জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্থির করলেন এবার কালাচাঁদের বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। মনে মনে তাঁর পাত্রী স্থির করাই ছিল। একদিন এই উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়িয়া গ্রামে গিয়ে তাঁর পুরানো বন্ধু রাধামোহন লাহিড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাধামোহনের দুইটি বিবাহ-যোগ্যা সুন্দরী কন্যা ছিল কিন্তু তিনি তখনও কন্যাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পান নি। কুলীন কন্যার বিবাহ দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিতেই রাধামোহন তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। রাধামোহনের দুই কন্যার সঙ্গেই কালাচাঁদের বিবাহ হবে। বহুবিবাহ সে যুগে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। সুতরাং একসঙ্গে দুই বোনের পাণিগ্রহণ কোন নীতিবিগর্হিত বা অস্বাভাবিক

কিছু ছিল না।

কালাচাঁদ যথাসময়ে প্রস্তাব শুনল। বিরোধিতা করার কোন চিন্তাই তার মনে আসে নি। বৃদ্ধ পিতামহ পিতৃহারা কালাচাঁদকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। অবাধ্যতা করে তাঁর অন্তরে আঘাত দেবার কথা কালাচাঁদ ভাবতেই পারে না। যে অপরিণত বয়সে লোকে এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কঠোর সংগ্রাম করে সেই বয়সে রূপালী ও রূপানীর সঙ্গে কালাচাঁদের বিবাহ হয়ে গেল।

কালাচাঁদ দুবছর শ্বশুরবাড়ীতে থেকে শ্বশুরের আতিথেয়তা উপভোগ করলো। দুই স্ত্রীকে বীর্যবান পুরুষের মত উপভোগ করে সুখ ও সম্ভোগের মধ্যে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করল।

কালাচাঁদ দীর্ঘদেহী, খড়্গনাসা, উন্নতললাট ঋজু ব্রাহ্মণ। গৌরবর্ণ, সুদর্শন এবং সুপুরুষ। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে কুঞ্চিত কেশদাম। তাকে দেখলে যে কোন মেয়ে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়বে। ভাদুড়িয়া গ্রামের লোকেরা যে তাকে ভালবাসবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

উনিশ বছর বয়সে কালাচাঁদ পেশা নির্বাচনের মনস্থ করল। সামান্য জমিজমা তাদের আছে। লোকে তাকে জমিদারও বলে কিন্তু সামান্য জমিদারী দেখা আর স্ত্রীসহবাসের নিস্তরঙ্গ ও নিরুত্তাপ জীবনে কালাচাঁদের মন নেই। সৈনিক হতে হবে। রণদামামা কালাচাঁদের রক্তে নাচন আনে। সৈনিক হওয়া ছাড়া অন্য কোন পেশা গ্রহণ করার কথা কালাচাঁদ ভাবতেই পারে না। কিন্তু ভাদুড়িয়া গ্রামের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল কালাচাঁদ পুরোহিত হোক। এমন শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ যুবকের ওটাইতো পেশা হওয়া উচিত। বেদান্তের নবতর ব্যাখ্যা দিয়ে মুমূর্ষু হিন্দুধর্মকে প্রাণবন্ত করে তুলবে কালাচাঁদ। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুবকের দল এগিয়ে আসবে ধর্মের পথে। কিন্তু কালাচাঁদের ওই পেশা পছন্দ

নয়। দীর্ঘ যাগযজ্ঞ ও অন্তহীন ধর্মালোচনার চেয়ে দ্বৈরথ সমর তার কাছে অনেক বেশী উত্তেজনাব্যঞ্জক। ক্ষাত্রতেজের দীপ্ত মহিমা বেঁচে উঠবে সৈনিকের ব্রতে। যুদ্ধ করতে বেশী আনন্দ পায় কালাচাঁদ। মৃগয়া করতে সে অরণ্যে অরণ্যে খোলা তলোয়ার নিয়ে ছুটে বেড়ায়। শত্রু দেখলে জিঘাংসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জন্মে ব্রাহ্মণ কিন্তু পেশায় কালাচাঁদ হবে ক্ষত্রিয় বীর।

অতএব তন্দায় ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। সুলতানের সঙ্গে দেখা করে তার মনোবাসনা জানান প্রয়োজন। সুলতানকে পিতৃপরিচয় দেওয়া দরকার। কালাচাঁদ একদিন ভাদুড়িয়া ত্যাগ করে তন্দায় এসে হাজির হল। সুলতানকে তার আকাংখার কথা জানাল। পিতৃপরিচয় দিল। নয়নচাঁদ সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বাসী ফৌজদার ছিলেন। তার ছেলেকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া। যোগ্য বাবার যোগ্য পুত্র বলেই কালাচাঁদকে সুলতানের মনে হল। সুলতান কালাচাঁদকে তাঁর সৈন্যদলে গ্রহণ করলেন। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই কালাচাঁদ ফৌজদার পদে উন্নীত হয়ে প্রমাণ করল যে সুলতান যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যপদে নিযুক্ত করেছিলেন।

নবাবের সেনাবাহিনীতে সামান্য ফৌজীসিপাহী হয়ে যোগ দেওয়ায় কালাচাঁদের পরিবার খুশী হয় নি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রথমে বেঁকে বসেছিলেন, পরে কালাচাঁদের অনুনয়ে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসহকারে রাজী হন। মাত্র তেইশ বছর বয়সে ফৌজদার পদলাভ করায় পরিবারের সকলেই খুশী হল। রাধামোহন তাঁর দুই কন্যাকে ভাদুড়িয়া থেকে তন্দায় স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এদের সঙ্গে কালাচাঁদের মাতামহী ইন্দুবালা দেবীও এলেন। কালাচাঁদ তার দুই স্ত্রী ও মাতামহীকে নিয়ে সুখে-স্বপ্নে দিন কাটাতে লাগল।

॥ দুই ॥

যখন সুলতান সুলেমান কররানি তন্দ্রা নগরী নির্মাণে ব্যস্ত তখন হিন্দুরা রাজপ্রাসাদ থেকে কিছু দূরে এক সতীনারীর স্মরণে 'সতীঘাট' নির্মাণ করে। সাধারণতঃ হিন্দু নরনারীরা সকাল ও সন্ধ্যায় স্নান-আহ্নিকের জন্যে এই ঘাট ব্যবহার করত। দুলারী প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে তাই দেখত। ন্যাড়ামাথায় টিকিধারী হিন্দু ব্রাহ্মণগুলোকে তার অদ্ভুত জীব বলে মনে হত। অবগাহন স্নান এবং পূজা সম্পর্কে হিন্দুরা অত্যন্ত গর্ব বোধ করত। এদের জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে অদ্ভুত এবং আশ্চর্য ধারণার কথা দুলারী জানতে পেরেছিল। এদের উদ্ধত ব্যবহার এবং অর্থহীন গোঁড়ামী দেখে সময় সময় দুলারী বিরক্ত বোধ করলেও মোটের উপর সে মজাই পেত বেশী। এদের তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন আর ছোট ছোট মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যে তাঁরা নাকি বাস করেন। তার বাবা গোঁড়া মুসলমান হয়েও কেন যে হিন্দুদের মন্দির তৈরী করতে অনুমতি দেন ভেবে পায় না দুলারী।

বৃদ্ধ সুলতান আর আগের মত ধর্মোন্মাদ নেই। তিনি এখন অনেক উদার হয়েছেন। অনেক পরধর্মমতসহিষ্ণু হয়েছেন। রক্তের তৃষ্ণা আর তার নেই। তিনি আর হিন্দুদের মনে আঘাত দিতে চান না। মন্দির নির্মাণে তাই তিনি কোন বাধা দেন না। অবাধে চলে পূজা-অর্চনা।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নবাবনন্দিনী মহানন্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকে সতীঘাটে হিন্দু ব্রাহ্মণদের স্নান আহ্নিক দেখে। বেশ মজা লাগে। কৌতূহল বোধ করে। ধীরে ধীরে

সে কৌতূহল কখন মনের অজ্ঞাতসারে আগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দুলারীর জানার ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণেরা কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করে? এর পিছনে শাস্ত্রের কি বিধান আছে? ধর্মের কি উদ্দেশ্য আছে? কৌতূহল মেটাবার জন্যে দুলারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে পাঠায়। তাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের তত্ত্ব নিয়ে, তাদের জাতিভেদ প্রথা নিয়ে, তাদের সতীদাহ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করল দিনের পর দিন। দুলারী আশ্চর্য হয়ে গেল এই দেখে যে হিন্দুরা মুসলমানের মতই গোঁড়া এবং ধর্মোন্মাদ। রাজশক্তির অভাবে শুধু নিষ্ফল আস্ফালন। সেই গোঁড়া ধর্মান্ধতার যুগে দুলারী ধীরে ধীরে উদার হয়ে যাচ্ছিল। হিন্দুধর্মের অনেক কিছু তার ভাল লাগছিল আবার অনেক কিছু তার কাছে পৈশাচিক বলে মনে হচ্ছিল। সতীদাহের মত কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতার মত কুপ্রথা কি করে কোন ধর্ম সমর্থন করে দুলারী ভেবে পায় না।

দুলারী জানতে পারল পণ্ডিতেরা তার কাছ থেকে চলে যাবার পর গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করত। মুসলমান বাড়ীতে প্রবেশ করায় এবং এক মুসলমান নারীর সঙ্গে কথা বলায় তারা নিজেদের অপবিত্র বলে মনে করত। তাই সুলতানের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তারা গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করত। এ কথা জানতে পেরে রাগে আর ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে উঠল দুলারী। নবাবনন্দিনীর পরধর্ম-সহিষ্ণুতা গভীরভাবে আহত হল। শুচিবাইগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের অমানুষিক নীচতা দুলারীকে বেদনায় মুহ্যমান করে দিল। এমন ধর্ম নিপাত যায় না কেন? মুসলমান বলে তাকে এত অপমান। ধীরে ধীরে দুলারী উপলব্ধি করতে পারে এই পুরোহিতগুলো ব্রাহ্মণ হলেও আসলে শয়তান। ভণ্ড ও বকধার্মিক ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা জাকিয়া বেগম পছন্দ করতেন না।

—দুলারী তুমি বিপদে পড়বে।

একদিন সরাসরি তিনি দুলারীকে বলেই ফেললেন।

—তুমি কি বলতে চাইছ আম্মাজান ?

—হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে তাদের ধর্ম নিয়ে আলোচনার কথা বলছি।

—ও তাই বল। কিন্তু আমি কি কোন অন্যায় করেছি ?

—অন্যায় নয় কিন্তু অবান্তর।

—হিন্দুদের ধর্মতত্ত্ব জানলে ক্ষতি কি আম্মাজান ?

—তোমার আব্বাজান এসব পছন্দ করবেন না।

—কিন্তু আমি পছন্দ করি। আমার কি নিজের কিছু করবার স্বাধীনতা নেই ?

জাকিয়া বেগম কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, ওদের কাছ থেকে কি ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান তুমি পেয়েছ দুলারী ?

—আমি জানতে পেরেছি সব মানুষই সমান আম্মাজান। হিন্দু-মুসলমানের আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অশুভ আশংকায় ভীত হয়ে উঠলেন জাকিয়া বেগম।

—তোমার আব্বাজান এসব কথা পছন্দ করবেন না দুলারী।

—আমি কোন অন্যায় তো করছি না আম্মাজান।

—ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নয়—

—আচ্ছা আম্মাজান তোমার পিতা হিন্দু থেকেই তো মুসলমান হয়েছিলেন—তুমিওতো তাই—

—দুলারী !

জাকিয়া বেগমের চোখে মুখে তীব্র ভর্ৎসনা বাঙ্ময় হয়ে উঠল।

—সত্যি কথা শুনে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই আম্মাজান। তুমি আমাকে যত ভালবাস একজন হিন্দু মা তার কন্যাকে ঠিক ততখানিই ভালবাসে। মাতৃত্ব সমস্ত নারীর ধর্ম আম্মাজান।

—ঐসব চিন্তা বিপদ ডেকে আনবে দুলারী। তুই মা ওই সব

বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস না।

—আম্মাজান, না জেনে যদি তোমায় আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে তুমি আমায় ক্ষমা কর।

—দুলারী তুই অন্য কথা বল মা।

দুলারী আর ওই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করল না।

দুলারীর আচরণ কেমন যেন পরিবর্তিত হতে থাকে। একদিন প্রিয়সখী গুলসান বলল, আপনাকে আমার আজকাল কেমন কেমন মনে হয়। আপনি কিসব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন শাহ্‌জাদি।

—তাই নাকিরে!

—হ্যাঁ, শাহ্‌জাদি, আমার মনে হচ্ছে ওই বামুন পণ্ডিতগুলোই আপনার মাথা খেয়েছে।

—দুলারী গুলসানের কথার কোন উত্তর দেয় না। শুধু একটু রহস্যময় হাসিতে তার ঠোট দুটো বিস্তৃত হয়। মন উচাটন হয়।

খোলা বাতায়ন দিয়ে প্রাসাদ কক্ষ থেকে দুলারী দেখে ব্রাহ্মণরা মহানন্দার জলে অবগাহন করছে। অবগাহন শেষে গায়ত্রী জপ করে। এখন আর এসব দুলারীর কাছে দুর্বোধ্য নয়। ব্রাহ্মণরা জপতপ ও আহ্নিক করে। সূর্যের দিকে জল ছিটিয়ে দেয়, দুপা মুড়ে পদ্মাসন করে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়। দেখতে দেখতে দুলারী সহসা সোজা হয়ে বসে।

মনে হল সে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। এমন কি সে দেখল? সে দেখল তার জীবনের প্রথম পুরুষ। প্রথম প্রেমিক।

*　　　*　　　*

কেন সে চমকে উঠল?

দৃঢ়পদবিক্ষেপে ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী সতীঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরণে মাটিতে লুটিয়ে পড়া সাদা শান্তিপুরী ধুতি—ব্রাহ্মণের পোষাক। শরীরের ঊর্ধাংশ অনাবৃত, কাঁধের উপর শুভ্র একগুচ্ছ উপবীত। কন্দর্পকান্তি দেহ। কুঞ্চিত কেশদাম কাঁধ পর্যন্ত

নেমে এসেছে। বীরত্বব্যঞ্জক দীর্ঘ চওড়া গোঁফ। ধীর, স্থির, শান্ত। স্বপ্নগভীর দুটি চোখ। রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ থেকে দুলারী দেখল কালাচাঁদ মহানন্দায় স্নান করতে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্নান সেরে কালাচাঁদ আবার সেই পথ দিয়ে ফিরে যায় ততক্ষণ দুলারী নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে বসে থাকল। এমন কন্দর্পকান্তি সুপুরুষ দুলারী এর আগে আর কখন দেখেনি। শাপভ্রষ্ট দেবদুলাল। যত সে দেখে ততই সে মুগ্ধ হয়। ততই দুর্বোধ্য অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসে। উত্তেজনায় তার সারা শরীর আন্দোলিত হয়। আরক্ত হয়ে ওঠে দুলারীর মুখমণ্ডল। তার সমগ্র সত্তা অসহ্য পুলকে কেঁপে ওঠে। এ কি হল দুলারীর? এই কি তার মনের মানুষ? এই কি তার জন্মজন্মান্তরের তপস্যার প্রাণপুরুষ? এর জন্যে কি সে হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করেছে?

কালাচাঁদ স্নান সেরে ফিরে যায়। সাতজন ছাতাবরদার তার পিছু পিছু অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে তাকে অনুসরণ করে চলে। যখন কালাচাঁদ স্নান করে, পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে বরদারেরা দূরে সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্নান শেষ করে কালাচাঁদ রাজপথ দিয়ে দূরে চলে যায়। অপলক নেত্রে দুলারী সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

কালাচাঁদ দূরে চলে গেলে দুলারী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। কালাচাঁদকে দেখলেই তার মনে এক আবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আর সেই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেলে অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে বেদনাহত দুলারী। প্রতি অঙ্গ কাঁদে তার প্রতি অঙ্গ তরে। এতদিনে কি দুলারী তার মনের মানুষের দেখা পেল? এরই জন্যে কি তার অনাঘ্রাত সতেরোটি বসন্ত অপেক্ষা করে রয়েছে?

কে এই যুবক? কে এই ব্যক্তি? কি তার নাম? কোথা থেকে সে এসেছে? কোথায় তার বাস? সে কি করে? ছাতাবরদাররা কেন দূরে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখায়? এমন

হাজার প্রশ্ন দুলারীর মনে ভিড় করে।

দুলারীর নিবেদিত হৃদয় অধীর আবেগে আন্দোলিত হয়। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ সকাল হলেই দুলারীকে টেনে নিয়ে যায় প্রাসাদ অলিন্দে। দুলারী তৃষিত নেত্রে চেয়ে থাকে মহানন্দার সতীঘাটের দিকে। সে আসবে। সে আসবে। তার হৃদয়ের পদ্ম বিকশিত হবে। কিন্তু কোথায় সেই কন্দর্পকান্তি মূর্তি? সময় চলে গেল। লগ্ন অতিক্রান্ত। তবু সে এলো না। অসহ্য বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল দুলারী।

পরের দিন আবার প্রতীক্ষায় প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকে দুলারী। চেয়ে চেয়ে কাল গোনে আর ধ্যান করে। অবশেষে সত্যাই তার মনের মানুষ এলো। প্রত্যহই আসতে লাগল। প্রতিদিনই দুলারীর তাকে দেখে। তার দেখা চাই।

* * *

সুলতান সোলেমান কররানী পুনরায় উৎকল অভিযান করার মনস্থ করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদলকে সুসজ্জিত করলেন। যথেষ্ট পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করলেন। দশ হাজার সুনিপুণ সৈন্য নিয়ে সোলেমান উৎকল অভিমুখে যাত্রা করলেন। কালাচাঁদ সুলতানের এই অভিযানে শরিক হতে চেয়েছিলেন কিন্তু সুলতান রাজী হলেন না। কালাচাঁদকে তন্দায় থাকার নির্দেশ দিলেন। রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব কালাচাঁদের উপর দিলেন সুলতান। কালাচাঁদ বয়সে নবীন। শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের অনেক সুযোগ সে জীবনে পাবে। বীরত্ব প্রদর্শনের এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার কালাচাঁদ দুঃখিত হলেও মর্মাহত হলো না। রাজাদেশ। কর্তব্য পালন করা সৈনিকের ধর্ম। কালাচাঁদ হতাশ হলেও যন্ত্রবৎ কর্তব্য সম্পাদন করে চলল। মাঝে কয়েকদিন কালাচাঁদ সুলতানের দূত হয়ে বিহারে গিয়েছিল বলে দুলারী তাকে মহানন্দায় স্নান করতে যেতে

দেখে নি। দুলারী অবশ্য এসব খবর কিছু জানত না।

দুলারী জানত কালাচাঁদ এক নিষ্ঠাবান ও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ যে প্রত্যহ মহানন্দায় স্নান করতে আসে এবং সে তাকে ভালবেসে ফেলেছে।

একদিন গুলসান বলল, শাহজাদী আপনি প্রেমে পড়েছেন।

একথা শুনে দুলারীর বিস্মিত হল না। অসুখীও হল না। সবার অগোচরে কোন মহৎ কাজ করে পরে তা জানাজানি হলে কর্মীর যে প্রচ্ছন্ন পরিতৃপ্তি দুলারীর চোখেমুখে তার ভাব ফুটে উঠল: এমন রূপবান পুরুষের প্রেমেই তো পড়া যায়। ডুব দিতে হলে সাগরেই ডুব দেওয়া দরকার—পচা ডোবায় ডুব দেওয়া যায় না। এমন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হলে দুলারীর নারীজন্ম সার্থক হবে। গুলসানের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে ভাবগভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে দুলারী অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলে, গুলসান, আমি আর পারছি না রে।

—শাহজাদী, মনে হচ্ছে আপনার তবিয়ৎ ঠিক নেই।

—তবিয়ৎ ঠিক আছে গুলসান—ঠিক নেই মন। আমার মন হারিয়ে গেছে গুলসান।

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গুলসান।

—আমি প্রেমে পড়েছি গুলসান। তুই ঠিকই বলেছিস।

গুলসান জানে কার অপেক্ষায় দুলারী প্রত্যহ ছুটে আসে প্রাসাদ অলিন্দে। কার অপেক্ষায় সে বাতায়ন পথে প্রহরের পর প্রহর মহানন্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। কার জন্যে সে পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। গুলসানও দেখেছে দুলারীর প্রেমিককে।

—কিন্তু শাহজাদী ও হিন্দু।

—ও পুরুষ আর আমি নারী।

—ও আদমী কাফের—

—ও কথা বলিস না গুলসান, ও আমার প্রেমিক। আমার মনের মানুষ।

—শাহজাদী এসব কথা শুনলে আপনার আব্বাজান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

—কেন? কেন? ও হিন্দু বলে? ও কাফের বলে? আর আমি তাই নয় বলে? তাই না গুলসান?

—আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন শাহজাদী।

—হ্যাঁ তাই। তোর কথা শুনে উত্তেজিত হওয়াই উচিত। এ দুনিয়ায় নারী পুরুষ বলে কিছু নেই—শুধু হিন্দু আর মুসলমান? প্রেমভালবাসা বলে কিছু নেই—শুধু হিন্দু আর মুসলমান? মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই, শুধু হিন্দু আর মুসলমান? হিন্দু মুসলমানের চেয়ে অনেক বড় পরিচয় আমাদের আছে গুলসান—সে হল আমরা মানুষ—ও পুরুষ আর আমি নারী, আমরা মিলে এক হতে চাই। আমাদের মিলনে হিন্দু হওয়া বা মুসলমান হওয়া কোন বাধা হবে না।

দুলারীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে গুলসানের মাথা নত হল। কিই বা বলতে পারে সে? এক পৌত্তলিক কাফেরের প্রতি আসক্ত হয়েছেন তাদের শাহজাদী। সুলতান কন্যার পক্ষে এক হিন্দু যুবকের প্রতি আসক্ত হওয়া, মহব্বৎ করা বিপদের কথা। কিন্তু বাঁদী হয়ে সে কি করতে পারে?

ধীরে ধীরে দুলারীর রাগ কমতে থাকে। তার মনে অনুশোচনা দেখা দেয়। রাগ করা সে পছন্দ করে না। এটা উন্মত্ততা। দুলারীর আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছে দিনদিন। দুলারী নিজেই বুঝতে পারে না এর কারণ। সে কি নিজের সত্তাকে ফিরে পাবে না? একদিন সহসা দুলারী গুলসানকে জিজ্ঞাসা করল—তুই কখনো প্রেমে পড়েছিস গুলসান? এমন অতর্কিত প্রশ্নে গুলসান বিষম খায়।

—তুই কখনো প্রেমে পড়িসনি তাই তুই বুঝবি না আমার কি জ্বালা। গুলসান?—বলুন শাহজাদী।

—আমি প্রেমে পড়েছি গুলসান।

উত্তরে কি বলবে ভেবে না পেলে গুলসান বলল, আমি আপনাকে ভালবাসি শাহজাদী।

—তা আমি জানি গুলসান।

—আপনাকে খুশী করতে আমি জান কোরবানি করতে পারি শাহজাদী—

—তাও আমি জানি গুলসান। জান কোরবানিঃ প্রয়োজন নেই—তুই এক কাজ কর—জেনে আয় কে ওই ব্রাহ্মণ।

—শাহজাদী ওই ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার কৌতূহল দেখে অনেক আগেই একজন খোজা মারফৎ আমি সে খবর সংগ্রহ করেছি। ওই ব্রাহ্মণের নাম কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ি।

—একথা তুই আমায় বলিস নি কেন ?

—শাহজাদী আমি দুঃখিত—আপনি কখনও আমাকে ওর কথা জিজ্ঞাসা করেন নি।

—হুঁ। কি নাম বললি ?

—কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী—ডাক নাম রাজু।

—কালাচাঁদ ?

—জী হ্যাঁ।

—কালাচাঁদ গোরাচাঁদ—হিন্দুদের নাম ওরকমই হয় তাই না গুলসান ? কালাচাঁদ কি বিবাহিত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ শাহজাদী। কালাচাঁদের দুই স্ত্রী আছে।

দুলারী এক অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, আমি কালাচাঁদের তৃতীয় স্ত্রী হব। আমি কালাচাঁদকে ভালবাসি, আমি তাকে সাদী করব।

—কালাচাঁদের আর কোন খবর জানিস গুলসান ? স্বভাব চরিত্র কেমন ?

—সাচ্চা হীরে শাহজাদী। কখন বাইজী বাড়ী যায় না, মদ খায় না, সৈনিক হলেও কখনও বেলেল্লাপনা করে না। খুব বড়

বীর—যুদ্ধ করতে ভালবাসে। সুলতান কালাচাঁদকে ফৌজদার করে দিয়েছে।

— এরকম সাচ্চা মরদই আমার চাই।

—কিন্তু শাহজাদী কার এতো সাহস আছে যে সুলতানের কানে আপনার মনের কথা জানাবে?

—আব্বাজান উৎকল জয়ে গেছেন। ফিরে আসলে আমি নিজেই তাঁকে নিবেদন করব।

গুলসান অজানা আশংকায় নির্বাক হয়ে গেল। একে সাহস বলে না, বলে স্রেফ পাগলামী। দীর্ঘদিন ধরে সে সুলতানকে দেখে আসছে। যেমন গোঁড়া তেমন গোঁয়ার। ইদানিং অবশ্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যত পরিবর্তনই হোক, একমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যার বিবাহ নিশ্চয়ই তিনি সামান্য এক কাফের ফৌজদারের সঙ্গে দেবেন না। শুনলেই খাপ থেকে তলোয়ার খুলবেন। তারপর কি হতে পারে সে কথা কল্পনা করতেই গুলসান আতংকে শিউরে উঠল।

--কালাচাঁদ কি করে?

—সে সুলতানের এক বিশ্বাসী ফৌজদার। সে এক নিষ্ঠাবান গোঁড়া ব্রাহ্মণ।

--আমি জানি সে ব্রাহ্মণ। তুই এমন ভাবে কথা বলছিস যেন আমি চাঁদে হাত বাড়িয়েছে।

—হিন্দুরা বড় অদ্ভুত জাত শাহাজাদী।

—সে আমি জানি গুলসান।

—আপনাকে সাদী করলে তার জাত যাবে।

—এক নিষ্ঠুর ক্রোধ আর ঘৃণা দুলারীর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ল।

—আমি ওদের জাত মারবো। আমাকে সাদী করলে যদি ওদের ধর্ম অপবিত্র হয় তবে আমি ওদের ধর্ম অপবিত্র করবো। আমরা

ওদের সব অচল অনড় অর্থহীন কুসংস্কার ছিন্নভিন্ন করে দেবো। আমাদের প্রেমে—এক নারী ও পুরুষের প্রেমে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হবে!

—খুবই বিপজ্জনক চিন্তা শাহজাদী! ফিস ফিস করে বলল গুলসান।

—কেন, মৃত্যু হতে পারে? তাহলে আমি মরবো। একদিন মরতে তো হবেই। প্রেমের জন্যে না হয় মরি। আমি মরলে প্রতি সন্ধ্যায় আমার কবরের ওপর একটা করে দীপ জ্বেলে দিস গুলসান।

—কিন্তু শাহজাদী কালাচাঁদ আপনাকে জানে না। সে জানে না যে আপনি তাকে ভালবাসেন। আপনি তাকে ভালবাসেন কিন্তু সে কি আপনাকে ভালবাসে? সে কি আপনার ভালবাসার মর্যাদা দেবে?

—ঠিক বলেছিস গুলসান।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল দুলারী। তারপর বলল—আজ সন্ধ্যায় আমরা বজরায় করে মহানন্দায় জলবিহার করবো। গুলসান তোর ওপর দায়িত্ব রইল কালাচাঁদ যেন মহানন্দার তীরে আসে।

গুলসান শংকিত হল।

—সে কি করে হবে শাহজাদী?

—ওই সময় নদীতীরে আসার জন্যে কালাচাঁদকে খবর পাঠা। বলবি আজ সন্ধ্যায় নবাবকন্যা মহানন্দায় জলকেলি করবে। সুলতান কালাচাঁদকে নদী তীরে পাহারা দেবার আদেশ দিয়ে গেছেন।

—কিন্তু আপনার আব্বাজান এসব মিথ্যা কথা জানলে আমাদের আস্ত রাখবেন না।

—যা বলি তাই কর, গুলসান। তুই যা, যদি আজ সন্ধ্যায় কালাচাঁদকে আমি মহানন্দার তীরে না দেখি তাহলে আমি তোকে কোতল করবো।

নিরুপায় হয়ে গুলসান চলে গেল।

দুলারী বাতায়ন পাশে সরে এসে একদৃষ্টে মহানন্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। নদী বহে চলেছে প্রশান্ত গতিতে। কান পেতে কি যেন এক দূরাগত কণ্ঠস্বর শোনে দুলারী। ধীরে ধীরে তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে স্মিত হাসি। আজ সন্ধ্যায় তার মনের মানুষের দেখা মিলবে। ফাঁদ পাতা হয়েছে ধরা পড়বে বিহঙ্গ। সার্থক হবে তার বিতংস রচনা। তার প্রেমে সে কালাচাঁদকে পাগল করে দেবে যেমন করে দুলারী তার প্রেমে পাগল। তাদের প্রেমের সাক্ষী থাকবে মহানন্দা আর পশ্চিম আকাশের অস্তায়মান সূর্য।

ছকে বাঁধা ঘুঁটির চাল কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। কালাচাঁদ যথা সময়ে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে মহানন্দার তীরে এলো। নবাব কন্যা জলকেলি করবে আর কালাচাঁদ তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নদী তীরে থাকবে। সৈনিকের মত ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে কালাচাঁদ দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে পাশ দিয়ে বজরায় করে কয়েকবার যাওয়া আসা করল দুলারী। চার চোখ মিলল। প্রেমার্ত নারীর দুচোখের ভাষা কালাচাঁদ পড়তে জানে কিন্তু তার দিক থেকে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেল না। একবারও সে মাথা ঘোরালো না। বজরা সতীঘাটে এসে থামল। দুলারী বজরা থেকে নেমে কালাচাঁদের পাশ দিয়ে গিয়ে পাল্কীতে উঠল। গায়ে গায়ে ঠেকল। কিন্তু কালাচাঁদ দুলারীকে দেখার কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না। তার প্রেমের কোন প্রত্যুত্তর দিল না। দুলারী আহত হল। রাজনন্দিনী অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল। নিজেকে বাসনাবিচ্ছুরিত এক নিবেদিত প্রাণ নির্লজ্জ ও প্রত্যাখ্যাত বেশ্যা বলে মনে হল। অপমাণিত দুলারীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। দুলারী ঘরে ফিরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়ল।

দুলারীর বুকে প্রেমের আগুন দাউ দাউ জ্বলে উঠেছে। কালাচাঁদের অনাদর আর উপেক্ষায় তার প্রেম আরও তীব্র হয়ে উঠল। প্রেমের আগুন আরও লেলিহান হয়ে উঠল। অবোধ

মনকে সে প্রবোধ দিতে লাগল। এই তো মহৎ ব্যক্তির লক্ষণ। এই মহত্ব পুরুষের মধ্যে দুর্লভ। বিশেষ করে সৈনিকদের মধ্যে। টলে না, গলে না, নারীর রূপ দেখে ভোলে না। কালাচাঁদ ছাড়া দুলারী আর কাউকে বিয়ে করবে না। আব্বাজান উড়িষ্যা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুলারীকে অপেক্ষা করতে হবে। সকাল সন্ধ্যা গবাক্ষ পথে মহানন্দার দিকে তাকিয়ে থাকে দুলারী আর ভোর রাত্রে সুখস্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে কালাচাঁদ তাকে আদর সোহাগ করছে। আলিঙ্গন আর চুম্বনে পিষে ফেলছে। তার পেশীবহুল পৌরুষদীপ্ত উত্তপ্ত দেহটা দিয়ে তার নরম, অনাবৃত্ত কবোষ্ণ দেহটা দলিতমথিত করছে। দুলারী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কালাচাঁদকে বাদ দিয়ে দুলারীর বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। হয় কালাচাঁদ, নয় মৃত্যু।

*　　　*　　　*

একমাস পরে সুলতান তন্দায় ফিরে এলেন। মনে হল হঠাৎ যেন দশ বছর তাঁর বয়স বেড়ে গেছে। এবারও উৎকল অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। পরপর দুবার মুকুন্দদেবের হাতে পাঠান বীরের একি শোচনীয় পরাজয়? প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নত মস্তকে ফিরে এসেছেন সোলেমান। কিন্তু প্রাসাদে ফিরে এসে দুলারীকে দেখে সুলতান পরাজয়ের অনেকখানি বেদনা ভুলে গেলেন।

দুলারী সাহস সঞ্চয় করে একদিন পরেই সুলতানের কাছে এসে হাজির হল। সোলেমান তখন নারী, সুরা ও সঙ্গীত নিয়ে স্ফূর্তি করছিলেন। উৎকল পরাজয়ের বেদনা ভোলার চেষ্টা করছিলেন। দুলারী এসে উপস্থিত হল। অসময়ে জলসাঘরে কন্যাকে দেখে সুলতান মনে মনে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেন। যাই হোক, তিনি নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সবাই ঘর থেকে চলে গেলে দুলারী বলল, আব্বাজান, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

—কাছে আয় মা।

দুলারী ধীরে ধীরে সোলেমানের পাশে গিয়ে বসল। সুলতান তার চুলে হাত বুলাতে লাগলেন।

—আব্বাজান, আমার একটা আর্জি আছে।

—বেশ তো বল মা। সহাস্যে ঘাড় নাড়লেন সোলেমান।

—আমি সাদী করতে চাই আব্বাজান—

সুলতানের হাসি থেমে গেল। দুলারীর চুলের মধ্যে তাঁর হাত থেমে গেল। মোটা গলায় বললেন,—সতেরো বছরের মেয়ের কাছ থেকে এটা খুবই অদ্ভুত প্রস্তাব বলে মনে হচ্ছে।

—আমাকে আজ হোক, কাল হোক একদিন বিয়ে তো করতেই হবে আব্বাজান। সেটা এখন করলেই বা ক্ষতি কি?

সোলেমান দুলারীর অস্বাভাবিক নির্লজ্জ প্রশ্নে প্রথমে বেশ কিছুটা হতবুদ্ধি হলেও রাগ করলেন না। দুলারীকে কেমন যেন রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটা কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে পড়েছে। বিয়ে করতে চায়—বেশ তো বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ে করব বললেই তো আর বিয়ে হয় না। নবাব নন্দিনীর জন্যে উচ্চ-বংশীয় উপযুক্ত পাত্র চাই। সন্ধান নিয়ে খুঁজে বার করতে হবে উপযুক্ত পাত্র। এ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

—তোমার সাদী করা কি খুবই জরুরী ব্যাপার মা?

—হ্যাঁ আব্বাজান, খুবই জরুরী। আমি একটি যুবককে ভালবাসি আব্বাজান।

আর একবার চমকে উঠলেন সোলেমান। এতক্ষণে তিনি আসল ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। যে হাত দিয়ে দুলারীর চুলে হাত বুলাচ্ছিলেন সেই হাত দিয়ে দুলারীর চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। সুলতান ভাবতেই পারে না যে তাঁর কিশোরী কন্যা এত বেয়াড়া হয়ে গেছে। সুলতান কন্যাকে গভীরভাবে ভালবাসেন। তাকে সুখী করার জন্যে তিনি সবকিছু করতে পারেন। করেছেনও।

আস্তে আস্তে সম্বিৎ ফিরে এলো সোলেমানের। তিনি বিরক্তি ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে সেই ব্যক্তি?

হুলারী বুঝল পিতার মন নরম হয়েছে যদিও কিছুটা দুঃখ পেয়েছেন। অবশ্য সে জানত তার বিবাহের প্রস্তাব শুনলে তার আব্বাজান আহত হবেন।

—কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী।

সোলেমান নাম শুনে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে হাসতে শুরু করলেন। এতো ভালবাসা নয়, স্রেফ প্রশংসা। প্রত্যেক মেয়েই বীর ও বলশালী ব্যক্তিকে ভালবাসবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া কালাচাঁদ রূপবান ও গুণবান পুরুষ।

—কোন কালাচাঁদ? ফৌজদার কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী?

—জী হ্যাঁ।

—কালাচাঁদ একটা সামান্য লোক—

—আব্বাজান, সে সামান্য লোক নয়—সে সম্ভ্রান্তবংশীয় জমিদার সন্তান।

—তুমি তো তাহলে অনেক খবরই রাখ দেখছি।

—কিছু খবর অবশ্যই আমার নিতে হয়েছে আব্বাজান। কালাচাঁদ অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। রাজকীয় মর্যাদায় সে চলাফেরা করে। আমি জেনেছি সে ব্রাহ্মণ এবং যথেষ্ট পণ্ডিত ও দানেশমন্দ।

—কি করে তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল?

—পরিচয় আমার হয়নি। প্রতিদিন প্রত্যূষে সে মহানন্দায় স্নান করতে যায়। আমি বাতায়ন পথে তাকে দেখি। আমি এখনও তার সঙ্গে কোনদিন কোন কথা বলিনি। কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি আব্বাজান।

—দেখেই ভালবেসে ফেলেছিস! সুলতানের কথায় তাচ্ছিল্যভরা শ্লেষ।

—কালাচাঁদকে ছাড়া আমি অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারব না আব্বাজান—

—তাই নাকি? সুলতানের কণ্ঠে কৌতুক তীব্রতর হল।

—আমার সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হবে না আব্বাজান। গম্ভীর কণ্ঠে বলল দুলারী।

—মা, তুই বড় অবুঝ। তুই তাকে ভালবাসিস বলছিস কিন্তু তার সঙ্গে তোর কোন কথাবার্তা হয় নি। সে যে তোকে ভালবাসবে একথা ধরে নিচ্ছিস কেন?

—আমার ভালবাসা দিয়ে আমি তাকে জয় করব আব্বাজান।

—হা আল্লা!

হো হো করে সুলেমান হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, দুলারী, তুই পাগল। তুই যাকে ভালবাসিস সে তোকে জানেই না। এমন আজগুবি কথা কে কবে শুনেছে বল?

কিন্তু দুলারী কোন কথা বলল না। তার গম্ভীর ও বিষণ্ন মুখের দিকে চেয়ে সুলতান বললেন, বেশ, তবে তাই হোক। আমার কন্যার প্রেম সার্থকতা লাভ করুক। কালাচাঁদের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। কালাচাঁদ যদি তোকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে আমি তাকে হত্যা করব।

—বহুৎ সুক্রিয়া আব্বাজান।

দুলারী চলে গেলে সোলেমান তার উজির সৈয়দ হায়দর হুসেনকে ডেকে পাঠালেন। উজির বৃদ্ধ এবং ভূয়োদর্শী ব্যক্তি। সাদা ধবধবে দাড়িতে ভরা মুখমণ্ডল। পরিধানে কালো আলখাল্লা। গলায় শাঁখের মালা। উজির আসতেই সোলেমান বললেন, আমার একটা পারিবারিক সমস্যা দেখা দিয়েছে হুসেন সাহেব।

সোলেমান নবাব হলেও উজির সৈয়দ হায়দর হুসেনকে তার বয়স ও জ্ঞানের জন্যে শ্রদ্ধা করতেন।

—বলুন জাঁহাপনা। উৎকর্ণ হলেন সৈয়দ সাহেব।

—আমার মেয়ে ফৌজদার কালাচাঁদ রায়ের প্রেমে পড়েছে।

—তোফা তোফা!

—আপনি কি মনে করেন এদের বিবাহ সম্ভব?

—আপনি একজন কাফেরের সঙ্গে রাজকন্যা দুলারীর বিবাহ দেবেন ?

—ইসলামের কি কোন আপত্তি আছে ?

—না—মানে—

সুলতান বাধা দিয়ে বললেন, কালাচাঁদ সাহসী—সুপুরুষ এবং বীরপুরুষ। তার বাবাও আমার একজন বিশ্বাসী ফৌজদার ছিল।

—একজন ফৌজদারের এত সাহস যে সোলেমানের কন্যার দিকে নজর দেয়।

উজিরের কথায় যুগপৎ রাগ ও বিস্ময় প্রকাশ পেল।

—না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়—বরং ঠিক তার উল্টোটাই হয়েছে সৈয়দসাহেব। দুলারীই কালাচাঁদকে নদীতে স্নান করতে যেতে দেখে তাকে ভালোবেসেছে। কালাচাঁদ দুলারীকে দেখে নি—তাকে বোধ হয় জানেও না। আপনি জানেন সৈয়দসাহেব আমার মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য আমি আসমানের চাঁদেও হাত দিতে পারি। আমি চাই ওদের সাদী হোক। যেখানে আমার মেয়ের প্রেম, সেখানে ধর্মের কোন বাধা আমি মানব না।

উজির সৈয়দ হায়দর হুসেন তাঁর দাড়িতে হাত চালাতে চালাতে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন,—এ বিবাহ হতে পারে যদি কালাচাঁদ পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

—দুলারীকে বিবাহ করতে যদি কালাচাঁদকে তাই হতে হয়, তবে তাই হবে। মেয়েটা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে—ওর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

—আমাকে কি করতে বলেন জাঁহাপনা ?

—এখনই কালাচাঁদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান।

* * * *

উজির সৈয়দ হায়দর হুসেন কালাচাঁদকে ডেকে পাঠালেন। তলব

পাওয়া মাত্রই কালাচাঁদ উজিরের দরবারে এসে হাজির হল। দীর্ঘ কুর্নিশ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কালাচাঁদের সুদীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল পোষাক, বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল উজীরকে অভিভূত করল। মনে মনে ডুলারীর পছন্দকে তারিফ করলেন। এমন সুদর্শন যুবকের প্রতি যে কোন মেয়েই প্রেমাসক্ত হবে এতে আশ্চর্য কিছু নেই। ডুলারীর কসুর কোথায়? যে রূপ ও গুণ থাকলে কুমারী মেয়েরা পাগলের মত পুরুষের পিছনে ছোটে তার সবই আছে কালাচাঁদের। উজির তার পাশের আসন দেখিয়ে কালাচাঁদকে বললেন, এখানে বসুন ফৌজদার।

প্রধানমন্ত্রীর পাশে একজন সামান্য সৈনিকের বসাটা কি অশোভন নয়? কালাচাঁদ একটু বিব্রত বোধ করল।

—আমি বরং এখানেই দাঁড়াই, আপনি বলুন কি বলতে চান।

—আমার আদেশ পালন করুন ফৌজদার। আমার পাশে এসে বসুন।

অনিচ্ছা সহকারে কালাচাঁদ উজিরের পাশে বসল।

—আপনি ভাগ্যবান। সুলতানের কৃপাদৃষ্টি আপনার উপর পড়েছে কালাচাঁদ বাবু—বোধ হয় ঠিক বলা হল না—সুলতান কন্যার বললেই ঠিক বলা হয়। নবাবের ইচ্ছা আপনি তাঁর কন্যা ডুলারীকে বিবাহ করুন।

—বিবাহ? নবাবনন্দিনীকে?

বিষম খেল কালাচাঁদ। সে কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে? নবাব কন্যা তাকে বিবাহ করতে চায়? না কি প্রহেলিকা?

—হ্যাঁ, বিবাহ। কিন্তু বিবাহ করার পূর্বে আপনাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। কাফেরের সঙ্গে তো আর ইমানদার মুসলমান কন্যার সাদী হতে পারে না।

—হেঁয়ালি ও অস্পষ্টতার ধূসর আবরণ সরে গেল। কি জঘন্য প্রস্তাব! আসলে তাকে মুসলমান করার জন্যে এটা একটা জাল পাতা হয়েছে মাত্র! তার মত ব্রাহ্মণ যুবককে ধর্মচ্যুত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

রাগে কালাচাঁদের মুখ লাল হয়ে উঠল। তড়িৎগতিতে সে উঠে দাঁড়াল।

—কখনই নয়—কিছুতেই নয়—

—আপনার বোধ হয় জানা আছে সুলতানকে 'না' বলে এরাজ্যে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না কালাচাঁদ বাবু। সতর্ক করে দিলেন উজির।

—এ এক হাস্যকর প্রস্তাব। আমি সুলতানের কন্যা বিবাহ করব কেন? আমার দুই স্ত্রী বর্তমান। কেন আমি তৃতীয় স্ত্রী চাইব? তা আবার মুসলমানী?

—নবাবনন্দিনীর আপনাকে পছন্দ হয়েছে।

—আমায় কেন? সৈন্যদলে শত শত সম্ভ্রান্তবংশীয় সুপুরুষ যুবক রয়েছে, নবাবনন্দিনী তার মধ্যে থেকে তার মনের মত পাত্র বেছে নিক। যে কোন যুবক দুলারীর মত রাজকন্যা পেলে হাতে স্বর্গ পাবে।

কালাচাঁদের জবাব শুনে বৃদ্ধ উজির রাগে ফেটে পড়লেন না বা আহত বাঘের মত গর্জনও করলেন না। তিনি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বললেন।

—কালাচাঁদ বাবু আপনি মূর্খ। আপনার এই আচরণ আপনার সমূহ বিপদ ডেকে আনবে।

—জনাব, ব্যাপারটা একটা প্রহসনের মত শোনাচ্ছে না কি? আমি একজন সামান্য ফৌজদার। আমি যেমন আছি তেমনই থাকতে চাই। নবাব পরিবারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—আমি নবাবের নিমক খাই কিন্তু তাই বলে আমি তো নোকর বান্দা নই।

—কালাচাঁদ বাবু, আপনি অবুঝ হচ্ছেন। সবই তো কিসমৎ কা খেল। রাজকন্যা আপনাকে ভালবেসেছে—সে আপনাকে বিবাহ করতে চায়। সুলতানও তাঁর একমাত্র মেয়ের বাসনায় বাদ সাধতে চান না। আমি সুলতানের হয়ে আপনার কাছে এই বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছি।

—আমার আর কিছু বলার নেই জনাব। আমায় যাবার অনুমতি দিন।

কালাচাঁদ চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে ফিরল। কিন্তু উজিরের হাততালির শব্দ হতেই চারদিক থেকে চারজন সৈন্য খোলা তলোয়ার হাতে এসে কালাচাঁদকে ঘিরে ফেলল।

—অন্ধকার কারাগারে কালাচাঁদকে নিক্ষেপ কর। উজির সৈয়দ হায়দার হুসেন খুব শান্তস্বরে সৈন্যদের আদেশ দিলেন।

সৈন্যরা কালাচাঁদের তরবারি কেড়ে নিয়ে তাকে কারাকক্ষে ঢুকিয়ে দিল। ব্যাপারটা এমনই অতর্কিত ভাবে ঘটে গেল যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কালাচাঁদ কোনরূপ প্রতিরোধ করার অবকাশ পেল না।

উজির সুলতানকে যথাসময়ে সব কথা বললেন। সুলতান শুনে আঘাত পেলেন। দুঃখিত হলেন।

—লোকটা মূর্খ এবং আস্ত একটা গোঁয়ারও বটে। কিছুদিন অন্ধকারে পচলে ওর বোধশক্তি আবার ফিরে আসবে। তখন বাছাধন আপনার প্রস্তাবে রাজী না হয়ে যাবে না।

উজির সুলতানকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন।

—কিন্তু দুলারীকে আমি কি বলব? কালাচাঁদ মুসলমান হোক বা না হোক সেটা বড় কথা নয়—কথা হল সে আমার জামাতা হবে। যদি কালাচাঁদের গোঁয়ারতুমি না সারে?

—তাহলে তার মৃত্যু। আপনার আদেশ অগ্রাহ্য করে এ রাজ্যে সে বেঁচে থাকতে পারে না।

—হুম্। কিন্তু তাতে আমার লাভ কি?

—কালাচাঁদ মারা গেলে দুলারী আস্তে আস্তে তার কথা ভুলে যাবে জাঁহাপনা।

—আমার মেয়েকে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী জানি হুসেন সাহেব। সে অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কোনদিনই সে কালাচাঁদকে ভুলতে পারবে না।

—কিন্তু কালাচাঁদকে ছেড়ে দিলে সে আপনাকে উপহাসের পাত্র করে তুলবে।

—মানে? কথাটা বুঝতে না পেরে নবাবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

—সে একথা রাজ্যময় রাষ্ট্র করে দেবে। সবাই এ খবর জেনে যাবে। মুখের উপর সে সুলতানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সুলতানকে অপমান করেছে।

—তাহলে কি করতে বলেন?

—মৃত্যু। জাঁহাপনা, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কালাচাঁদের অন্য কোন শাস্তির কথা ভাবা যায় না।

—কিন্তু বিনা কারণে কালাচাঁদের মৃত্যুদণ্ড আমি দিই কি করে? সেটা অন্যায় হবে।

উজির মনে মনে বলল, এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন এটাই তোমার জীবনের প্রথম অন্যায় কাজ। মুখে বলল,

—বিচার হবে; কাজী আয়াতুল্লা আদালতে কালাচাঁদের বিচার করবেন। সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতভাবেই কালাচাঁদের শাস্তি বিধান করা হবে। রাজাদেশ অমান্য করার ঔদ্ধত্য। কালাচাঁদের বিরুদ্ধে রাজাদেশ অমান্যের অভিযোগ আনা হবে।

—আমার আইন খুবই নিষ্ঠুর এবং নির্মম সৈয়দ সাহেব কিন্তু অন্যায় নয়

—কিন্তু কালাচাঁদ আপনার আদেশ অমান্য করেছে—এটা তো কোন মিথ্যা নয়, জাঁহাপনা।

—হুম্। উজিরের যুক্তি সুলতানের ভালো লাগছিল না।

—আমি আর অন্য কোনপথ দেখছি না, জাঁহাপনা। হয় বিচারে কালাচাঁদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে নতুবা তাকে অন্ধ কারাগারে সারাজীবন বন্দী করে রাখতে হবে। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখলে বিপদ আছে। আবার তাকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না।

—একজন নিরপরাধ মানুষকে আইনের চোখে দোষী সাজিয়ে মারা জঘন্যতম অপরাধ।

উজির কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, আমি সব কিছু চিন্তা করে দেখেছি কিন্তু কালাচাঁদকে মারার এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

সুলতান দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। কালাচাঁদ যে এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি করবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করলেন। অশান্তভাবে ঘরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে পদচারণা করতে লাগলেন। তারপর সহসা পালংকে বসে পড়লেন মাথা হেঁট করে। সুলতান যখন মাথা তুললেন তখন উজির নবাবকে সেলাম দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরে চলে গেলেন।

উজির জ্ঞানবৃদ্ধ, ভূয়োদর্শী ব্যক্তি তবুও সে সুলতানকে সব সময় বুঝতে পারে না। সুলতান কত নিরীহ, নিরপরাধ লোককে অকারণে হত্যা করেছেন কিন্তু কালাচাঁদের ব্যাপারে তিনি রাজী হতে পারছেন না। কালাচাঁদের সঙ্গে তাঁর মেয়ে জড়িত তাই এ ব্যাপারে সুলতান এত দুর্বল, এত অসহায়। তামাম দুনিয়া তাঁর পদতলে কিন্তু মেয়ের কাছে তিনি যেন এক কৃতদাস। যে ব্যক্তির মধ্যে নিষ্ঠুর পশুপ্রবৃত্তি এত প্রবল তার মধ্যে কি করে কুসুমকোমল মন থাকতে পারে; উজিরের কাছে এ বুদ্ধির অগম্য। বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না উজির তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে মাথা থেকে তা পরিত্যাগ করে।

পরের দিন বিচারের নামে এক নিষ্ঠুর প্রহসন অনুষ্ঠিত হল। কাজী আয়াতুল্লা বৃদ্ধ ব্যক্তি, তার এক পা কবরের দিকে চলে গেছে। দিনে পাঁচওয়াক্ত নমাজ পড়েন। কিন্তু যখন কোন মানুষকে প্রাণদণ্ড দেন তখন তিনি অন্তরে এক পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করেন। আর যদি অপরাধী কাফের হয় তাহলে তো কথাই নেই। আজ যা হবে সেটা একটা পূর্ব-পরিকল্পিত বিচার। বিচারের রায় আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। উজিরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। জনসমক্ষে বিচার হবে লোক দেখাবার জন্যে। জনতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে।

রাজধানীতে কালাচাঁদের রাজদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। আজ তার বিচার হবে। বিচারালয় লোকে লোকারণ্য। সুলতান, উজীর, আমীর, ওমরাহ, নগরীর গণ্যমান্য ও ইতর ব্যক্তিতে আদালত পূর্ণ। কালাচাঁদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। কাজী আয়াতুল্লা একটার পর একটা করে সব পড়ে গেলেন। কিন্তু এসব অভিযোগ সুলতান উপেক্ষা করতে পারেন। সবশেষে কালাচাঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ আনা হল। রাজদ্রোহ। কালাচাঁদ রাজাদেশ অমান্য করেছে। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

—আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কথা শুনলেন। আপনার কিছু বলার আছে? কাজী জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি কখনই রাজাদেশ অমান্য করি নি। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কারণেই আমি সুলতানের আদেশ পালন করতে পারি নি। কেন আমি সুলতানের আদেশ অমান্য করেছি কাজী কি সে কথা জানতে চান না?

—না তার কোন প্রয়োজন নেই। এটাই যথেষ্ট। তুমি নিজ মুখে সবার সামনে কবুল করলে যে তুমি রাজাদেশ অমান্য করেছ। রাজাদেশ অমান্য করা আর রাজদ্রোহ করা একই কথা। এই অভিযোগেই তোমার বিচার হবে।

—আল-জনাবে কাজী, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার—রাজ্যের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। কালাচাঁদ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল।

—এর অর্থ কি সুলতান যখন মসনদে বসেন তখনই সুলতান, যখন তিনি প্রাসাদে থাকেন তখন নন?

—না। অস্ফুটস্বরে কালাচাঁদ উত্তর দিল।

—তুমি সুলতানের কর্তৃত্বকে অপমান করছ—এটা বিশ্বাসঘাতকতা —এটা রাজদ্রোহ। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।

বিচার প্রাঙ্গণে মৃদু গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল।

কালাচাঁদ জানে আবেদন করা বৃথা। যে ব্যক্তিকে সুলতান

অপছন্দ করেন, তাকে এমনভাবেই খতম করা হয়।

কালাচাঁদের মুখে যে ভাব দেখা দিল তা রাগ নয়, ঘৃণা।

—আজ থেকে তিন দিন পরে তোমার ফাঁসি হবে। ইতিমধ্যে যদি তুমি মত পরিবর্তন কর, যদি তুমি সুলতানের নির্দেশ পালন করতে রাজী থাক তাহলে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার পুনর্বিচার হবে।

কাজী শেষ বিচারের রায় দিয়ে উঠে পড়লেন।

* * *

কালাচাঁদের মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ রাজধানীর সর্বত্র দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। সুলতানের অন্দর মহলেও এ খবর পৌঁছাতে দেরী হল না। দুলারী এ খবর জানতে পারল গুলসানের কাছ থেকে।

—শাহজাদী, কালাচাঁদের বিচার হয়েছে আজ। তিন দিন পরে ওর ফাঁসী হবে।

ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে গুলসান দুলারীকে বলল।

কালাচাঁদের ফাঁসি হবে কেন?

—আমার মনে হয় সে আপনাকে সাদী করতে রাজী হয় নি—বোধ হয় সেজন্যেই।

—মূর্খ তুই। সত্যি কারণ কি?

উত্তেজিত দুলারীর চোখেমুখে ভীতি ও হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

—আমি আর কিছুই জানি না শাহজাদী, আপনি বিশ্বাস করুন। কাজী বলেছে কালাচাঁদ রাজাদেশ অমান্য করেছে—এটা বিশ্বাসঘাতকতা।

দুলারী সহসা নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ এবং অনুতপ্ত বোধ করল।

—আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করার জন্যে কেন আব্বাজান একজন মানুষকে হত্যা করবেন?

—আমি শুনেছি তাকে প্রথমে মুসলমান হতে বলা হয়েছিল কিন্তু সে অস্বীকার করেছে।

দুলারীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এইবার ব্যাপারটা তার কাছে

খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—তাহলে কালাচাঁদ মুসলমান হতে অস্বীকার করেছে—আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেনি। ভালই হয়েছে সে মুসলমান হতে অস্বীকার করেছে। সে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—কেন সে তার ধর্মমত পরিত্যাগ করবে?

আমি চাই কালাচাঁদ, হিন্দু থাকবে আর তার স্ত্রী হয়ে আমিও হিন্দু হব। কালাচাঁদ সাচ্চা হিন্দু। সাচ্চা ইনসান।

—শাহ্‌জাদী, কালাচাঁদের এতটুকু মৃত্যুভয় নেই। কাজী যখন তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিল কালাচাঁদের এতটুকু ভাবান্তর দেখা দিল না। সে এতটুকু ভয় পেল না।

—কালাচাঁদ বীরপুরুষ। সুলতানের প্রস্তাবে 'না' বলার জন্যে সাহসের অতিরিক্ত কিছু দরকার। সেটা কালাচাঁদের আছে। গুলসান, তাই তো আমি তাকে ভালবেসেছি।

—শাহ্‌জাদী আপনি মনের মানুষের দেখা পেলেন কিন্তু কাছে পেলেন না। আর মাত্র তিনটি দিন—

—না—কালাচাঁদের মৃত্যু হবে না। আমি তাকে মরতে দেব না। দুলারীর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল বজ্রকঠিন দৃঢ়তা।

—কিন্তু তা কি আর সম্ভব হবে শাহ্‌জাদী?

—সম্ভব করতে হবে।

—কিন্তু কেমন করে?

—এখনও তা আমি জানি না। কিন্তু পথ আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। তুই যা গুলসান, আমায় ভাবতে দে।

গুলসান ত্বরিৎপদে ঘর ছেড়ে চলে গেল। দুলারী অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দুলারী ঘর ছেড়ে প্রাসাদ অলিন্দে এসে দাঁড়াল। সম্মুখে বহে চলেছে স্বচ্ছ সলিলা নিস্তরঙ্গ মহানন্দা। মহানন্দার দিকে চেয়ে দুলারী আপন মনে বলল, হিন্দুরা তোমায় পূজা করে—আমি তোমায় ভালবাসি মহানন্দা। তুমি

আমায় হতাশ করবে না, আমি জানি। তুমি আমায় বলে দাও কি করে কালাচাঁদকে বাঁচান যায়। ওকে ছেড়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব না। যদি তুমি পথ না দেখাও মহানন্দা, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অতল জলের তলায় ডুবে মরব।

ধীরে বহে চলে মহানন্দা। প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবুও দুলারী একদৃষ্টে মহানন্দার দিকে চেয়ে বসে থাকে। সে কল্পনায় দেখতে পায় দৃঢ় পায়ে ছাতাবরদার সমভিব্যহারে কালাচাঁদ সতীঘাটে স্নান করতে যাচ্ছে। কোমর অবধি জলে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছে, সূর্যের বন্দনা গান গাইছে। স্নান শেষে কোথায় কোন দিগন্তে সে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ তন্দ্রাভিভূতা দুলারী তড়িৎগতিতে সোজা হয়ে উঠল। একটা মতলব তার মাথায় এসেছে। হ্যাঁ, তাই করতে হবে। কালাচাঁদকে বাঁচাবার ওটাই একমাত্র পথ। দেখা যাক। পরদিন দুলারী সুলতানের কক্ষে এলো।

—আয় মা।

দুলারীকে বিমর্ষকণ্ঠে সুলতান আহ্বান জানালেন।

—আব্বাজান, কালাচাঁদকে বাঁচাতে হবে।

—এখন আর আমার কিছু করার নেই মা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুলতান।

—কেন কিছু করার নেই?

—ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে মা।

—আব্বাজান, আপনি বাংলা বিহারের অধিপতি। আপনি পারেন না, এমন কি আছে? আপনি ইচ্ছা করলে কাজীর বিধান উল্টে দিতে পারেন।

—না, মা, তা আমি পারি না।

—আব্বাজান, কালাচাঁদকে আপনি যেমন করে হোক বাঁচান। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল দুলারী।

—তোর ব্যথা কি আমি বুঝি না মা? কিন্তু কি করব বল মা, এখন আর কিছু করার নেই আমার।

—এমন কি রাজদ্রোহের কাজ কালাচাঁদ করেছিল যে তার প্রাণদণ্ড দেওয়া হল?

—তুই ক্ষমা কর মা—এখন আমার আর কিছু করার নেই।

—তবে জেনে রাখুন আব্বাজান, কালাচাঁদ মরবে না—আমি তাকে মরতে দেব না।

দৃঢ়পদবিক্ষেপে দুলারী বনহংসীর মত ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

সুলতান মনে দুঃখ পেলেন। মেয়েকে দুঃখ দেওয়ায় তিনি বিমর্ষ হলেন। দুলারীর সঙ্গে কথা বলতে তার এখন ভয় হয়। মনের অগোচর পাপ নেই। সুলতান জানেন কালাচাঁদকে মারার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কালাচাঁদের মৃত্যুই এখন তাঁর কাম্য। কালাচাঁদ মুসলমান হতে অস্বীকার করেছে। তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাঁর আদেশ অমান্য করেছে। মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি। কালাচাঁদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দুলারী কয়েকদিন কাঁদবে। চুল বাঁধবে না। খাবে না। নতুন সাজপোষাক পরবে না। কিন্তু সে কদিন? তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় সব ভুলিয়ে দেবে। মহানন্দা ভুলিয়ে দেবে তার হৃদয়ের দুঃখ।

দুলারী আর কালাচাঁদের জন্যে সুলেমানকে কোন অনুরোধ বা উপরোধ করল না। সে বুঝতে পেরেছে কালাচাঁদকে মারার পিছনে অন্য কোন ফন্দী কাজ করছে। সুতরাং সুলতানকে অনুরোধ করা বৃথা তিনি তাঁর কোন কথাই শুনবেন না। তিনি যে পরিকল্পনা করেছেন তাই করবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। দুলারীও ফন্দী আঁটতে জানে। দরকার হলে দুলারীও সুলতান, উজির ও কাজীকে শিক্ষা দিতে পারে।

কালাচাঁদের প্রাণদণ্ডের খবর পেয়ে ভাদুড়িয়া থেকে বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্র নাথ হন্তদন্ত হয়ে তন্দায় ছুটে এলেন। তিনি রূপালী ও রূপানীকে নিয়ে সুলতানের কাছে গেলেন। কালাচাঁদের জীবন ভিক্ষা চাইলেন।

অনেক অনুনয়-বিনয় এবং কাকুতি-মিনতি করলেন কিন্তু সুলতানের মতের কোন পরিবর্তন হল না। তাঁর এক কথা—আমার কিছু করার নেই। কালাচাঁদের দুই স্ত্রীর কান্না দেখেও সুলতান বিচলিত হলেন না। তাঁর অন্তর একটুকু বিগলিত হল না। বিচার হয়েছে। বিচারে কালাচাঁদ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। বিচারের রায় দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর এর বিরুদ্ধে কি করা যেতে পারে?

—কালাচাঁদকে কি বাঁচানোর কোন পথ নেই জাঁহাপনা?

জ্ঞানেন্দ্রনাথের শেষ প্রশ্ন।

—না। সে রাজাদেশ অমান্য করেছে—সে রাজদ্রোহী। রাজদ্রোহীর শাস্তি সে পেয়েছে। আমরা তো আর কানুন বদলাতে পারি না।

—কালাচাঁদের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ করে দিন—আমি তার মত পরিবর্তন করাব।

—কোন লাভ হবে না।

—জনাব কালাচাঁদ আপনার কি আদেশ অমান্য করেছে তা কি আমি জানতে পারি?

—বৃদ্ধ, আপনি কি মনে করেন, আপনিই শুধু কালাচাঁদকে স্নেহ করেন? আমিও তাকে স্নেহ করি। আমার মেয়ে তাকে ভালবাসে। সৈন্যরা তাকে ভালোবাসে। তন্দার নাগরিকেরা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু রাজদ্রোহ রাজদ্রোহই আর তার পরিণাম মৃত্যু।

—কিন্তু জাঁহাপনা কালাচাঁদ একজন সামান্য যুবক। কিই বা তার বয়স। সে ভুল করতে পারে। একবার যদি আপনি আমায় তার সঙ্গে কথা বলতে অনুমতি দেন তাহলে তার মত পাল্টে দেব।

সুলতান জানতেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন যদি জানতে পারেন যে কালাচাঁদ মুসলমান হতে অস্বীকার করেছে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কালাচাঁদকে মত পরিবর্তন করতে বলবেন না। তিনি শুধু বললেন,

—তা আর হয় না।

বিফল মনোরথ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভগ্ন হৃদয়ে কালাচাঁদের দুই স্ত্রীকে নিয়ে গৃহে ফিরলেন। আসন্ন মৃত্যুর গভীর অন্ধকার নেমে এলো কালাচাঁদের পরিবারের উপর। নিষ্ঠুর আঘাতে রূপালী ও রূপানী পাষাণী হয়ে গেছে। হিন্দুনারীর পতি ছাড়া গতি নেই। বেঁচে থেকে তারা কি করবে? কালাচাঁদের যদি প্রাণদণ্ড হয় তাহলে মহানন্দার তীরে যে চিতা জ্বলবে তাতে শুধু কালাচাঁদই পুড়বে না। রূপালী ও রূপানীও সেই চিতায় সহমৃতা হয়ে সতী হবে।

॥ তিন ॥

তৃতীয় দিবসে সকালবেলা প্রহরীবেষ্টিত কালাচাঁদকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় রাজপ্রাসাদের অদূরে এক মুক্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হল। পাশেই বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। সুলতান এক উচ্চ আসনে এসে বসলেন। তাঁর পাশে এসে উজির একটি অপেক্ষাকৃত নিচু আসনে বসে দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাঙ্গণস্থল আমীর-ওমরাহ এবং নাগরিকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই অধীর আগ্রহ ও চাপা উত্তেজনা নিয়ে কালাচাঁদের মৃত্যুদণ্ড প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। সেই বিশাল জনতার একপাশে অশ্রুসজল নেত্রে বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় পুত্রের মৃত্যু দেখেছেন। আজ পৌত্রের মৃত্যু দেখতে হচ্ছে। জীবনে এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আর কি হতে পারে?

শৃংখলিত কালাচাঁদ সোজা হয়ে বধ্যমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তার চোখেমুখে কোথাও মৃত্যুভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। সে সোজা কাজী ও উজিরের দিকে তাকিয়েছিল। সুলতান মনে মনে বিচলিত বোধ করলেন। তাঁর দুঃখ হল কিন্তু তিনি নিরুপায়। কালাচাঁদ অত্যন্ত উদ্ধত, অহঙ্কারী ও গর্বিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ হোক।

উপস্থিত জনতার সকলেই এই সুদর্শন যুবকের প্রাণদণ্ডের জন্যে দুঃখ বোধ করছিল। কালাচাঁদ সবার প্রিয়। প্রত্যেকে তাকে ভালবাসে। সবার মুখে শুধু একটাই প্রশ্ন—কি রাজাদেশ কালাচাঁদ অমান্য করেছে

সেকথা কেউ বলছে না কেন?

—জাঁহাপনা, প্রাণদণ্ডের সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। কাজী শান্ত স্বরে সুলতানকে বললেন।

—উত্তম। জহ্লাদকে ডেকে পাঠান।

কাজী একজন সৈনিকের দিকে চেয়ে ইশারা করতেই সে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো। সঙ্গে এক বিকটদর্শন কদাকার, খর্বাকৃতি, প্রায় উলঙ্গ কাফ্রি ঘাতক। হাতে তার খাঁড়ার মত এক ধারাল অস্ত্র।

হাবসী জহ্লাদ সুলতানের সামনে এসে আভূমি নত হয়ে সালাম করল। কালাচাঁদের হাবভাব দেখে, তার মানসিক দৃঢ়তা দেখে, হাবসী জহ্লাদ বেশ আশ্চর্য হল। সাধারণতঃ যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাদের সে ভীত এবং অভিভূত হতে দেখেছে। মরার ভয়েই মরে গেছে। কিন্তু এই লোকটার এতটুকু মৃত্যুভয় নেই? কি ধাতু দিয়ে লোকটা গড়া কে জানে।

কাজী ও উজির কালাচাঁদের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল, এখনও তুমি মুসলমান হতে অস্বীকার কর?

জনতার মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনি উঠল। চারিদিকে চাপা বিক্ষোভ দেখা দিল। এটাই তবে কালাচাঁদের মৃত্যুর কারণ! পিতামহ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

—অল-জনাবে কাজী, ধর্মত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুকে আমি শ্রেয় বলে মনে করি। আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি—হিন্দু হয়েই মরব।

গর্বিত কালাচাঁদের ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল।

—এখনও একবার ভেবে দেখতে পার।

—আমার ভাবা হয়ে গেছে। অস্ত্র তুলতে বলুন—আমি আমার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করছি। আমি মরব—জগতকে জানিয়ে দিয়ে যাব মুসলমান হওয়ার আগে হাজার বার মৃত্যুও শ্রেয়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়েছে। তাঁর ধার্মিক পৌত্রের ধর্মনিষ্ঠার

জন্যে গর্বে তাঁর বুক স্ফীত হয়ে উঠল। তিনি উচ্চস্বরে উদাত্তকণ্ঠে শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার মন্ত্রোচ্চারণ করলেন

—শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

সুলতান কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সব সময়ই গোলমাল সৃষ্টি কর দেখছি।

—জাহাঁপনা আমি আপনার কোন গোলমাল বা অসুবিধার সৃষ্টি কখনও করি না। আপনি আদেশ দিন—একটা তরবারির আঘাতে সব শেষ হয়ে যাক।

উজির ও কাজী শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সুলতানের কাছে গেল। চরম আদেশ দেবেন সুলতান। সুলতান মুখে কিছু না বলে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই উজির ঘাতকের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন। ঘাতক তার ভারী কুঠারের ধার পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্যে এককোপে একটা গাছের ডাল দ্বিখণ্ডিত করল। কালাচাঁদ এতটুকু বিচলিত হল না বা ভ্রূক্ষেপও করল না।

জহ্লাদ কালাচাঁদের কাছে এগিয়ে এসে কালাচাঁদকে হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে বসার ইঙ্গিত করল।

—না। আমি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আমার শিরচ্ছেদ কর। ব্রাহ্মণের ছেলে ম্লেচ্ছের কাছে মাথা নত করে না।

ঘাতক হতবম্ভ হয়ে গেল। দীর্ঘদেহী কালাচাঁদের কাঁধ খর্বাকৃতি কাত্রীর নাগালের বাইরে। যাই হোক কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে একটা পাথরের চৌকা খণ্ড এনে তার উপর দাঁড়িয়ে খাঁড়া বাগিয়ে তুলল। জনতা ভয় ও আতংকে চোখ বুজল।

—রুক যাও—রুক যাও—থাম—

এক নারী কণ্ঠের তীব্র এবং আর্ত চিৎকারে বধ্যভূমির বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে গেল। প্রত্যেকে বিস্মিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কার এ কণ্ঠস্বর? কার এ চিৎকার? সুলতানের কাজে

বাধা দেয় কার এত বুকের পাটা ? কার এত সাহস ?

উজির ও কাজী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সুলতান আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এক ঝোড়ো দমকা বাতাসের মত বধ্যমঞ্চের দিকে ছুটে এলো দুলারী।

নবাবনন্দিনী। স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বহ্নিমান চক্ষু।

ঘাতকের দিকে তাকিয়ে দুলারী তারস্বরে বলল, বান্দা রুক যা—

—দুলারী ? ক্রোধে সুলতান ফেটে পড়লেন।

ঘাতক বুঝতে পারছে না সে কি করবে।

রাজকন্যা ! রাজকন্যা ! জনতার চাপা কণ্ঠস্বর গুঞ্জন করে উঠল। যদিও খুব কম লোকই সুলতান কন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছে তবুও সবারই ধারণা এ অন্য কেউ হতে পারে না। দুলারীর অপরূপ সৌন্দর্য, রাজকীয় চেহারা এবং দুঃসাহস দেখে জনতার এই স্থির সিদ্ধান্ত।

—দুলারী তুই !

এতটুকু মেয়ে আইন অমান্য করতে সাহস পায়। অসহ্য এই দুঃসাহস।

—হ্যাঁ আমি দুলারী। প্রথমে আমাকে হত্যা না করে কালা-চাঁদকে কেউ হত্যা করতে পারবে না আব্বাজান।

জনতার মধ্যে চাপা আনন্দ ও উল্লাস ফেটে পড়ল। সুলতান কিংকর্তব্যবিমূঢ়। উজির ও কাজী পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। ঘাতক সুলতানের দিকে আদেশের অপেক্ষায় তাকিয়ে রইল।

বিস্মিত হল কালাচাঁদ। দুলারীর দুঃসাহস তাকে অভিভূত করে দিল। এই মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় ? এই মেয়ে তাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসে ? তার জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ? আর সে কিনা তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে ? পায়ে ঠেলে দিয়েছে মুসলমান বলে। জন্মের জন্য কেউ দায়ী নয়।

'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম—কালাচাঁদের চিন্তাধারা সব জট পাকিয়ে এলোমেলো হয়ে গেল।

—দুলারী, সরে যা। জহ্লাদকে তার কাজ করতে দে। এ কন্যার প্রতি পিতার অনুশাসন নয়। প্রজার প্রতি রাজার কঠোর আদেশ।

—আমি কিছুতেই সরব না। কে তার অপবিত্র হাত আমার গায়ে দেয় দেখি। খোদা কসম, জেনানার গায়ে হাত দিলে সে হাত আল্লা খতম করে দেবে। ইমানদার সাচ্চা মুসলমান জেনানার গায়ে হাত দেয় না।

—দুলারী সরে যা—

—আমি তো বলেছি আমি কিছুতেই সরব না। যদি কেউ আমার গায়ে হাত দেয় তাকে আমি ইবলিসের বাচ্চা বলে মনে করি।

সুলতান ক্রোধে উত্তেজিত হলেন। তিনি দুলারীর কাছে এগিয়ে এলেন। উজীর ও কাজীর মুখে কোন রা নেই। এটা সম্পূর্ণ রাজপরিবারের ব্যাপার। এতে মাথা গলানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না

কালাচাঁদ আর স্থির থাকতে পারল না। সে সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলল, যদি সুলতান আমার অতীত অপরাধ ক্ষমা করেন তাহলে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে রাজী আছি।

সুলতান যেন হাতে চাঁদ পেলেন। কালাচাঁদ তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ার জন্যেই তো মিথ্যা দোষারোপ করে, মেকী বিচারের অভিনয় করে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেজন্যেই তো এই খল নাটক।

—তুমি করবে? তুমি আমার কন্যা দুলারীকে বিবাহ করবে? সুলতান যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

—হঁ্যা জাঁহাপনা আমি একমুখে দুকথা বলি না।

—তুমি মুসলমান হবে?

—না।

দুলারী এগিয়ে এসে বলল, না আব্বাজান, আমিও চাই না কালাচাঁদ মুসলমান হোক। ও যা আছে তাই থাকবে। আমি ওর স্ত্রী হব। ও আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেই আমি খুশী হব।

—কালাচাঁদ তোমার প্রেমের মর্যাদা দিয়েছে দুলারী। তোমার সাহস ও সাচ্চা প্রেমের প্রশংসা না করে কেউ পারে না।

—ভুলে যাবেন না, আব্বাজান, আমি আপনারই কন্যা।

সুলতান সৈন্যদের দিকে ফিরে বললেন, কালাচাঁদকে মুক্ত কর।

একজন সৈনিক ছুটে গিয়ে সুলতানের আদেশ পালন করলো। কালাচাঁদের হাত ও পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হল। কালাচাঁদ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দুলারীর দিকে তাকাল। দুলারীর চোখে স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোতির বিচ্ছুরণ। চার চোখের মিলন হোল। দুলারী কালাচাঁদের কাছে সরে তার বুকে মুখ লুকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমাকে বিয়ে করার জন্য তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই কালাচাঁদ। তবে আমি এও চাই না যে তুমি দয়া করে, করুণা করে আমায় বিয়ে কর। তুমি আমায় ভালবেসে বিয়ে কর কালাচাঁদ— আমার ভালবাসা সার্থক হবে।

কালাচাঁদ আস্তে আস্তে বলল, এটা করুণা নয় দুলারী তবে ভালবাসাও বোধহয় নয়। বলতে পার, এটা প্রশংসা। আমি সৈনিক, প্রেমের জন্যে তোমার আত্মত্যাগ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবে এ কথাও বলছি, সময় দাও, আমি তোমায় ভালবাসব। তুমি আমায় যত ভালবাস তার চেয়েও বেশী তোমায় আমি ভালবাসব।

দুলারী আরও নিবিড়ভাবে কালাচাঁদের বুকে মাথা গুঁজে দিল।

কালাচাঁদ পার্শ্ববর্তী সৈনিকের ছুরিকাটা টেনে নিয়ে নিজের আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়ে দুলারীর সিঁথিতে মাখিয়ে দিয়ে বলল, সূর্য সাক্ষী, জনতা সাক্ষী, মহানন্দা সাক্ষী—দুলারী আজ থেকে কালাচাঁদ রায়ের ধর্মপত্নী হল।

রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে কালাচাঁদের সঙ্গে নবাব কন্যা দুলারীর বিবাহ হয়ে গেল। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, ইতর-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান সবাই এ বিবাহে ঢালাও নিমন্ত্রণ পেল। সারা রাজ্যে সাত দিন ধরে আনন্দের বন্যা বহে চলল। সুলতানের একমাত্র কন্যার বিয়ে সুতরাং জাঁকজমকটা বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য মুসলমান আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই দিয়েই দুলারীর সঙ্গে কালাচাঁদের বিবাহ হয়ে গেল।

রূপালী ও রূপানীর মাথায় বজ্রাঘাত হল। তৃতীয় সতীনে কোন আপত্তি নেই কিন্তু মুসলমান কন্যাকে সতীন হিসাবে তারা কেউ সহ্য করতে পারবে না। বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কালাচাঁদের প্রাণদণ্ড হলে যত দুঃখ ও বেদনা অনুভব করতেন তার দশগুণ বেশী দুঃখ পেলেন কালাচাঁদের মুসলমানী কন্যা বিবাহ করায়। অশান্তি ও ক্ষোভে তিনি গজরাতে থাকলেন। কালাচাঁদের মাতামহী ইন্দুবালা দেবী কালাচাঁদের আচরণে মর্মাহত হলেন। কালাচাঁদের বিবাহের পূর্বেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ রূপালী, রূপানী ও ইন্দুবালাদেবীকে নিয়ে তন্দা পরিত্যাগ করে ভাদুড়িয়া চলে গেলেন। কালাচাঁদের আর মুখ দর্শন করবেন না। পুরুষের একাধিক বিবাহ নিন্দনীয় নয়। তাই বলে ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান বিয়ে? কালাচাঁদের সঙ্গে এইবার পরিবারের কারুর কোন সম্পর্ক থাকবে না। কালাচাঁদ বংশের কুলাঙ্গার।

এ সব কথা ভাবার সময় কালাচাঁদের নেই। এসব কথা সে চিন্তাও করেনি। যে মেয়েকে সে বিয়ে করেছে সে তাকে গভীরভাবে ভালবাসে। ভালবাসার জন্যে সে মরতেও ভয় পায় না। এর প্রেমের প্রবল, প্রমত্ত তরঙ্গে ঝাঁপ না দিয়ে থাকা কোন প্রাণবান পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কালাচাঁদ দুলারীর প্রেমের স্রোতে ভেসে গেছে। সে বিশ্বজগৎ ভুলে গেছে। দুলারীর প্রেম তার সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন কালাচাঁদের একমাত্র চিন্তা দুলারী। দুলারীই তার ধ্যানজ্ঞান। তার জীবন দুলারীময়। সব সময়ই কালাচাঁদ দুলারীকে বুকে নিয়ে

আছে তবু যেন তার তৃপ্তি নেই। অতি দ্রুত দুলারীর প্রতি কালাচাঁদের প্রেম গাঢ় হতে থাকে। গাঢ় থেকে গাঢ়তর। দুলারীকে ছেড়ে একটা দিন হয়ত কাটানো যায় কিন্তু রাত কাটানো অসম্ভব। দুলারী কালাচাঁদের সত্তায় সত্তায় মিশে গেছে।

প্রেমের প্রাথমিক উদ্দামতা কমে এলে কালাচাঁদ-তার আত্মীয়স্বজন. স্ত্রী এবং প্রিয়জনের কথা ভাবতে শুরু করল। কিছুটা অনুশোচনাও হল। ওদের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া ঠিক হয়নি। ত্রুটি সংশোধন করা দরকার। নিজের পরিবারে ফিরে যাওয়া উচিত। দুলারীকেও সে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কালাচাঁদ সংবাদ পেল যে তার আত্মীয়স্বজন তন্দা ছেড়ে ভাদুড়িয়া চলে গেছে। বুঝল তারা তার উপর রাগ করে এখান থেকে চলে গেছে। তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা দরকার। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে হবে। দুলারী বলেছে রূপালী ও রূপানীকে সে আপন করে নেবে—দিদির মর্যাদা দেবে। জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সে পিতার মতো শ্রদ্ধা করবে।

একদিন কালাচাঁদ দুলারীকে বলল, তুমি জান, আমার আরও দুই স্ত্রী আছে। তারা সব দেশে চলে গেছে। আমি তাদের আবার ফিরিয়ে আনতে চাই।

—নিশ্চয়ই তুমি ভাদুড়িয়া যাবে। তোমার অন্য স্ত্রীদের আমি বহিনের মত ভালবাসব। যাও তাদের নিয়ে এস। তবে বেশী দেরী করবে না। তুমি তো জান তোমায় ছেড়ে আমি একটা দিনও কাটাতে পারি না।

কালাচাঁদ দুলারীকে বুক টেনে নিয়ে বলল, আমিই কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি দুলারী? দেরী হবে না—যাব আর আসব। মাত্র দু একদিনের ব্যাপার।

॥ চার ॥

বিবাহের পরই সুলতান কালাচাঁদকে সিপাহ্‌শালারের পদে

উন্নীত করে দিয়েছেন। রাজ জামাতা একজন সামান্য ফৌজদার হলে সুলতানের মান-সম্মান থাকে কোথায়? কালাচাঁদ সুলতানের কাছে এসে ভাদুড়িয়া যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। সুলতান সানন্দে কালাচাঁদকে নিজ গ্রামে যাবার অনুমতি দিলেন।

যথাসময়ে কালাচাঁদ অশ্বারোহণে ভাদুড়িয়া এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে মাত্র দুজন সৈন্য। কিন্তু সেখানে এসে দেখল ঝড় উঠেছে। গ্রামের পথে পরিচিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলেই সে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুতপায়ে চলে যায়। কালাচাঁদ বুঝল সে ধর্মচ্যুত হয়েছে। তাকে একঘরে করা হয়েছে। কালাচাঁদ এটা প্রত্যাশা করে নি। তার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল।

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে এসে কালাচাঁদ ঘোড়া থেকে নামল। মণ্ডপে বসেছিলেন গ্রামের প্রধান পুরোহিত শ্রুতিপ্রসাদ ও আরও কয়েকজন পুরোহিত। কালাচাঁদকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। কালাচাঁদের কাছে এসে শ্রুতিপ্রসাদ বললেন, কালাচাঁদ, তোমার সব কথাই ভাদুড়িয়া গ্রামের অধিবাসীরা জেনে গেছে। তুমি যবন কন্যা বিবাহ করেছ। তুমি পবিত্র হিন্দুধর্মকে অপবিত্র করেছ। হিন্দু সমাজে তোমার কোন স্থান নেই। তুমি জাতিচ্যুত। তুমি ব্রাত্য।

—আমি মুসলমানী বিয়ে করেছি কিন্তু হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করি নি। যে আমায় ভালবাসে তেমন একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি মাত্র—আমি কোন অন্যায় করি নি। আর সব মেয়ের মত দুলারীও একটা মেয়ে।

—সে মুসলমান, ম্লেচ্ছ। কালাচাঁদ তুমি ধর্মচ্যুত—তুমি একটি ভণ্ড—শয়তান।

—গালিগালাজ করবেন না। শাস্ত্রে গালিগালাজ দেওয়ার কোন বিধান নেই।

—অন্যায় করে তুমি শাস্ত্র আউড়ে নিজের পাপ ঢাকতে চাও?

—না, আমি কোন পাপ বা অন্যায় করি নি। কি করে আমি

আমার ধর্মকে অপবিত্র করলাম তা বুঝতে পারছি না। আবার বলছি আমি একজন নিরপরাধ, নিষ্পাপ সরল মেয়েকে বিবাহ করেছি।

—ম্লেচ্ছকে বিবাহ! তুমি একে বিবাহ বল? কোন হিন্দু তার পুত্রকন্যার সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে দেয় না।

কালাচাঁদ বুঝল এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ পুরোহিতকে যুক্তি দেখান নিরর্থক। যে ধর্ম তার অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেখানে অধিকার নিয়ে লড়াই করে লাভ কি? এ ধর্মপুস্তকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়—এ গোড়ামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কালাচাঁদ রাগে কাঁপতে কাঁপতে খাপ থেকে তলোয়ার বার করল। তাই দেখে শ্রুতিপ্রসাদ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা ভয়ে কাঁপতে থাকল।

—আমি তোদের কেটে খণ্ড খণ্ড করে শকুন দিয়ে খাওয়াতে পারি —কিন্তু আমি তা করব না। তোদের মত নোংরা লোকের শরীরে আমার তরবারি ঢুকিয়ে তাকে অপবিত্র করব না। কালাচাঁদের মুখে ঘৃণা আর অবজ্ঞা ফুটে উঠল।

কালাচাঁদকে তরবারি বার করতে দেখে পুরোহিতেরা ভয়ে চুপ করে গিয়েছিল। তারা ভীত হলেও নাত স্বীকার করল না। চিত্তরঞ্জন নামক একজন পুরোহিতের কালাচাঁদের প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। সে ফিসফিস করে বলল, একটা উপায় আছে কালাচাঁদ।

—তাই নাকি? কি, সেটা শুনি। কালাচাঁদ ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

—কালাচাঁদ তুমি পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাও। জগন্নাথ জাগ্রত দেবতা। তুমি সেখানে যাও, সাত দিন উপবাস করে প্রায়শ্চিত্ত কর। তুমি দিব্য জ্যোতির দর্শন পাবে। দেবতার প্রত্যাদেশ পাবে। তাহলেই তুমি পবিত্র হবে কালাচাঁদ, আর পতিত থাকবে না। অন্তেবাসী হবে না।

কালাচাঁদ তরবারি খাপে পুরল। জগন্নাথদেব জাগ্রত দেবতা। দেবতার প্রত্যাদেশ পাওয়া যাবে। চেতাবানী হবে। সে পাপমুক্ত হবে। কিন্তু কালাচাঁদ কি পাপ করেছে? কিন্তু যদি সে জগন্নাথের

মন্দিরে গিয়ে উপবাস করে, প্রার্থনা করে তবুও কি এই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতগুলো তাকে হিন্দু বলে গ্রহণ করবে? মনে হয় না। সংশয়ে দোলাচল কালাচাঁদ বলল। —বেশ আমি পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে যাব। সেখান থেকে ফিরে আবার আমি এখানে আসব।

কালাচাঁদ আর কোন কথা না বলে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল।

আস্তে আস্তে নিজ কুটির দ্বারের সামনে এসে কালাচাঁদ ঘোড়া থামাল। রূপালীর নাম ধরে ডাকল কিন্তু দরজা খুলে কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল না। কালাচাঁদ ঘোড়া থেকে নেমে নিজেই ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। দেখল জলচৌকির একপাশে প্রায় স্থবির পিতামহ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসে আছেন।

—দাদু—দাদু—

—বল—

—আমি কি কোন পাপ করেছি দাদু?

—না রাজু—তুমি কোন পাপ করনি। কিন্তু আমরা সমাজে বাস করে কি করে সমাজশাসন অস্বীকার করি বল? ওরা যা বলে আমরা তাই করি।

—জগন্নাথ দর্শন করলে কি সব অপবাদ ঘুচবে দাদু?

—হতে পারে। পাণ্ডাদের তেমন বিধান থাকলে তাই হবে।

—কিন্তু আমি এখনও উপবীতধারী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, দাদু। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করি নি—করবও না কোনদিন। আমি হিন্দু ছিলাম, আজও হিন্দু আছি, হিন্দু থাকব।

—তুমি কি জান না মুসলমান কন্যা বিবাহ করা মানেই ধর্মান্তরিত হওয়া।

—না, জানি না। অর্থহীন ও অযৌক্তিক বিধান আমি গ্রাহ্য করি না। আমার ধর্মের পুরোহিতদের এইসব ভণ্ডামী আর বুজরুকি দেখার আগে আমার মৃত্যু হলেই ভালো হত।

—তুমি বড় বেশী কড়া কথা বলছ রাজু—

কালাচাঁদ এক অদ্ভুত হাসি মুখে এনে বলব, আমার জীবন বিপন্ন আর আপনি বলছেন আমি কড়া কড়া কথা বলছি? দাদু আপনি আমায় কি করতে বলেন? আমি কি নতজানু হয়ে পুরোহিতদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করব? আমি কি বুক চাপড়াবো? চুল ছিড়ব? চিৎকার করে সকলকে ডেকে বলল, পাণ্ডাদের চোখে আমি অপরাধ করেছি? আপনি বলুন আমি কি করব?

—চিররঞ্জনের কথা শোন, জগন্নাথের মন্দিরে যাও, গিয়ে নিজেকে শুদ্ধ কর। তোমার প্রায়শ্চিত্তের ওটাই একমাত্র পথ রাজু।

—রূপালী ও রূপানী কোথায়? তারা কি আমার সঙ্গে একবার দেখাও করবে না? আমি কি তাদের কাছে অস্পৃশ্য?

রূপালী ও রূপাণী পাশের ঘরে ছিল। তারা ধীরে ধীরে কালাচাঁদের সামনে এলো। দুই বোন নীরবে কাঁদছে। তারা স্বামীকে ভালবাসে কিন্তু ধর্মের বন্ধন তার চেয়ে অনেক কঠিন।

—তুমিও আমাকে ঘৃণা কর রূপালী!

—ঘৃণা? আপনি কি করে একথা বলতে পারলেন?

—তবে কাঁদছ কেন?

—কাঁদছি এইজন্যে যে আপনি আর কখন আমাদের কাছে আসবেন না।

—তোমাদের কাছে আসাও কি আমার বারণ?

—স্বামীন্, আমরা আপনার স্ত্রী, এমন কি শক্তি আছে পৃথিবীতে যা আপনাকে আমাদের কাছে আসতে নিষেধ করতে পারে?

—তবে ওকথা বলছ কেন?

—আপনি আমাদের কাছে আসলে পুরোহিতেরা যে আমাদেরও জাতিচ্যুত করে দেবে। তখন আমরা কোথায় যাব?

—সে জন্যে ভীত?

—না আমরা এতটুকু ভীত নই। আমরা আপনার দাসী। স্ত্রী

সবসময়ই স্ত্রী—স্বামী সব সময়ই স্বামী। কোন ধর্মই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পরিবর্তন করতে পারে না।

—আমি তোমাদের আমার সঙ্গে তন্দ্রায় নিয়ে যাব।

—স্বামী ছাড়া হিন্দু নারীর অন্য কোন গতি নেই, আশ্রয় নেই। আপনি আদেশ করলে আমরা আনন্দের সঙ্গে আপনার সঙ্গে যাব।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, না, তোমরা এখানেই থাকবে। আমি তোমার সঙ্গে একমত যে স্ত্রীর স্থান স্বামীর পাশেই। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছ তোমার পুত্রকন্যার কথা? তোমার ছেলে মেয়ে জন্মালে তারা কি হবে? হিন্দু না মুসলমান না সমাজচ্যুত?

—অর্থহীন কথা বলছেন দাদু।

—হোক অর্থহীন কিন্তু অস্বীকার করবে কি করে? বল তোমার পুত্রকন্যার কি হবে? কোন হিন্দু তোমার ছেলেমেয়েকে বিবাহ করবে?

—আমার কোন সন্তান হবে না।

—তবে আর বিবাহের প্রয়োজন কি? পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা। স্ত্রীরই বা প্রয়োজন কি? শুধু জৈব কামনা চরিতার্থ করা?

বৃদ্ধা ইন্দুবালা এবার কথা বললেন।

—তুমি প্রবেশ করায় আমাদের এ গৃহ অপবিত্র হয়েছে। এখন পুরোহিত এনে মন্ত্র পাঠ করিয়ে এগৃহকে পবিত্র করতে হবে। আর তুমি যদি রূপালী বা রূপাণীকে স্পর্শ কর তাহলে তারাও অপবিত্র হবে—তাদের এ বাড়ীতে কোন স্থান হবে না।

—দাদীমা! আর্তনাদ করে উঠল কালাচাঁদ।

—তোর দাদীমা মরে গেছে। তুই ধর্মত্যাগী, দেবদ্রোহী—এ বাড়ীতে তোর কোন স্থান নেই।

—দাদীমা—

—তুই আর আমার নাম উচ্চারণ করিস, না কালাচাঁদ। —তোর

মত ধর্মত্যাগীর মৃত্যু হলেই আমি খুশী হতাম রাজু।

—বারবার বলছি আমি আমার ধর্মত্যাগ করিনি—আমি এখনও উপবীতধারী ব্রাহ্মণ।

—মুসলমানের মেয়ে বিয়ে করে হিন্দু থাকা যায় না এই সহজ সত্যটা তোর মাথায় ঢুকছে না কেন?

কালাচাঁদের মাতা এগিয়ে এসে বললেন, বাবা, রাজু তুমি পুরীধামে জগন্নাথদেবের কাছে যাও। দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে মা?

—হ্যাঁ বাবা আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু মনে হচ্ছে সমাজপতিরা আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করেছে, তীর্থদর্শন করে এলেও কিছু হবে বলে মনে হয় না।

—হবে বাবা, হবে বলছি।

—আমি মনে করি না আমার জগন্নাথ দর্শন করলে সমাজপতিরা মত পালটাবে এবং অনুতপ্ত হবে। তবে তুমি যখন বলছ, দাদু যখন বলছেন তখন আমি যাব।

কালাচাঁদের সঙ্গে যে দুজন সৈনিক এসেছিল সে তাদের বিদায় দিল। সুবেদারকে বলল আপনারা তন্দায় ফিরে যান, সুলতানকে বলবেন আমি পুরী যাচ্ছি জগন্নাথ দর্শনে, শীঘ্রই ফিরে আসব। আর এই পত্রটি দুলারীকে দেবেন।

সুবেদার দুজন তন্দায় ফিরে গেল। সেই দিনই রাতের অন্ধকারে কালাচাঁদ অশ্বারোহণে উড়িষ্যার দিকে চললো।

ওদরাদের দেশের নাম উড়িষ্যা। অতি প্রাচীনকাল থেকে ওদরা জাতির লোকেরাই এখানে বাস করত। স্মরণাতীত কাল থেকে উড়িষ্যা হিন্দুদের পবিত্র তীর্থভূমি। প্রাচীন ধর্মপুস্তকে এই দেশের পবিত্রতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কপিল সংহিতায় একে 'সর্ব-পাপহর দেশ' বলা হয়েছে। জগন্নাথ দর্শন করলে মহাপাপীরও সব

পাপ থেকে মুক্তি ঘটে। সর্বপাপহর উড়িষ্যা। শ্রীক্ষেত্রে কোন জাতিভেদ নেই। এখানে অন্ন উচ্ছিষ্ট হয় না।

কালাচাঁদ একাকী অশ্বারোহণে ভাদুড়িয়া থেকে উড়িষ্যার পথে চলল। উড়িষ্যা প্রবেশ করে সে তার ঘোড়া এক চটিতে রেখে চটির মালিককে কিছু টাকা দিয়ে ঘোড়ার কয়েকদিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলল। কয়েক দিন পরে সে ফিরে এসে তার ঘোড়া নিয়ে যাবে। কালাচাঁদ বৈতরণীর তীর অতিক্রম করে পুরীর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

বহু গ্রাম ও জনপদ অতিক্রম করে অবশেষে কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে এসে উপস্থিত হল। নীলাচল। দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্রের তীরে গড়ে ওঠা অপূর্ব দেবনগরী। নগরের মাঝখানে জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দির। কিছু দূরেই বন্যজন্তুপূর্ণ গভীর অরণ্য আর জলাভূমি।

এক সুউচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত বিশাল মন্দির। দৈর্ঘ্যে ৬৫২ ফুট, প্রস্থে ৬৩০ ফুট এবং উচ্চতা ২১৫ ফুট। এক বিশাল নীলাভ প্রস্তরখণ্ড কেটে মূল মন্দির নির্মিত হয়েছিল তাই এর নাম নীলাচল। প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে ছোট বড় সব মিলিয়ে ১২০টি মন্দির। কোনটি লক্ষ্মীর, কোনটি সরস্বতীর, কোনটি বিমলার, আবার কোনটি শনির। সুবিশাল মূল মন্দিরটি জগন্নাথদেবের। ২১৫ ফুট উঁচু। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র ও পতাকা। একে শ্রীমন্দির বা শ্রেষ্ঠ মন্দিরও বলা হয়।

কালাচাঁদ মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ধূসর অতীত থেকে শ্রীক্ষেত্রের দিকে ধর্মপ্রাণ হিন্দুর যে বিরাম-বিহীন অনন্ত পুণ্য যাত্রা শুরু হয়েছিল তারই শরিক আজ কালাচাঁদ। কালাচাঁদ ঘুরে ঘুরে দেখে। হিন্দু স্থাপত্যের এক অবিস্মরণীয় বিস্ময় এই দেবদেউল। কালাচাঁদ দেখল মন্দিরগাত্রে অসংখ্য নৃত্যপরা সুর-সুন্দরী আর কিছু নরনারীর বিভিন্ন আসনে বিচিত্র মিথুন দৃশ্য। পণ্ডিত

ও শাস্ত্রজ্ঞ কালাচাঁদের কাছে এর অর্থ জলের মত পরিষ্কার। সেই সময় বৌদ্ধদের প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের আকাংখা প্রবল হয়ে উঠেছিল আর তার ফলে দেশের জনসংখ্যা আশংকাজনক-ভাবে হ্রাস পেতে থাকে। জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার অর্থ রাজার রাজস্ব হ্রাস পাওয়া। শংকিত রাজারা জনসাধারণের চিন্তাধারাকে উল্টোপথে ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে থাকেন। মন্দিরেই সর্বাধিক জনসমাগম ঘটে। সুতরাং উড়িষ্যার রাজাদের অর্থানুকূল্যে মন্দির গাত্রে খোদিত হতে থাকল বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গিমায় নরনারীর মিথুন মূর্তি। শৃংগার-রত নরনারীর কামকেলীর চিত্র পুরী, কোনারক ও ভুবনেশ্বরের লক্ষ লক্ষ মন্দিরগাত্রে খোদিত হল। কামোত্তেজক হ্লাদিনী মিথুন মূর্তি। এর মধ্যে দিয়ে সেদিন জগতের সামনে একটাই বাণী উচ্চারিত হল জীবন ত্যাগের নয়—ভোগের। ভোগ ক্লীবের কর্ম নয়—বীর্যবানের ধর্ম। নাস্তির নয়—অস্তির। মর্ত জীবনে অমর্তলোকের মহিমা নিয়ে আসবে শৃংগার পারঙ্গমতা।

প্রধান দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে বাইশটা সিঁড়ি পার হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। বাইশটা সিঁড়ি বাইশটা তত্ত্বের প্রতীক। এই বাইশটা সিঁড়ি ভেঙ্গে জগন্নাথ বা সমস্ত জ্ঞানের আধারের সাক্ষাৎ মিলবে। কালাচাঁদ বাইশ সিঁড়ি অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করল।

মন্দিরের অভ্যন্তরে চারটি দালান—নাটমন্দির, ভোগমন্দির, জগমোহন এবং গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে আছেন বিগ্রহ। জগন্নাথ, বলভদ্র ও শুভদ্রার অসমাপ্ত মূর্তি। হাত-পা বিহীন তিনটি কাঠের মূর্তি। কেন এই অসমাপ্ত মূর্তি?

মালওয়ার পাণ্ডু বংশের রাজা উদয়নের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর উপাসক। তাঁর মনোবাসনা তিনি মর্ত্যে ভগবান বিষ্ণুর সবচেয়ে সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন স্বপ্ন দেখলেন সমুদ্রের জলে ভেসে আসছে একটি কাঠের গুঁড়ি—তাই দিয়ে তৈরী করতে হবে একটি জগন্নাথের মূর্তি। কিন্তু কে তৈরী করবে সেই মূর্তি? কে

দেখেছে বিষ্ণুর জগন্নাথ মূর্তিকে? রাজা অনেক অনুসন্ধান করেও কাউকে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলেন। অবশেষে একদিন স্বয়ং বিষ্ণু বৃদ্ধ ছুতরের বেশে রাজা সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা বৃদ্ধের কথাবার্তায় প্রীত হলেন। বৃদ্ধই বিষ্ণুমূর্তি তৈরী করবেন। তবে শর্ত থাকল যে তিনি ২১ দিনের মধ্যে মূর্তি তৈরী করবেন—এই সময়ের মধ্যে কেউ তাঁর কক্ষে প্রবেশ করবে না। কাজ শুরু হল। পনেরো দিন অতিবাহিত হয়ে যাবার পর রাজা দেখলেন ঘরের ভেতর থেকে কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি বৃদ্ধ ছুতার মারা গেছেন? আর ধৈর্য রাখতে না পেরে উদগ্রীব রাণী দরজা খুলে দেখেন বৃদ্ধ ছুতার নেই। শুধু পড়ে আছে হাত-পাবিহীন অসমাপ্ত তিনটি কাঠের মূর্তি।

কালাচাঁদ দেখল মন্দির প্রাঙ্গন পাণ্ডা-পুরোহিত, প্রহরী, দেবদাসী, গায়ক, বাদ্যশিল্পী, মূর্তিসজ্জাকারী ও দেশদেশান্তরের ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অমর্ত্যলোকের দেবতারা জেগে ওঠেন। তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্যে দেবদাসীরা নাটমন্দিরে নৃত্য শুরু করে। নৃত্যের তালে তালে সুমধুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিনীর সুরে বাদ্যকারগণ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে। এক স্বপ্নগভীর সুরলোকের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। তুরীয়ানন্দে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভোগমন্দিরে দর্শনার্থীরা পূজা দিয়ে ভোগ ক্রয় করেন। জগমোহন দালানে বসে দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ জগন্নাথদেবকে দেখে। গর্ভগৃহে জগন্নাথ, বলভদ্র ও শুভদ্রার অসমাপ্ত মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি স্বর্ণালংকার ও মণিমাণিক্য খচিত আবরণ দ্বারা সুসজ্জিত।

মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মার্কণ্ড, ইন্দ্রদ্যুম্ন, রোহিণীকুণ্ড ইত্যাদি নামে কতকগুলি পুষ্করিণী আছে। কালাচাঁদ রোহিণীকুণ্ডে স্নান করে এসে জগমোহন দালানে বসল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সে দেখল বৈষ্ণবরা বিশাল বিশাল পাখা দিয়ে জগন্নাথদেবের মাথায় বাতাস করছে। গীতবাদ্যের শব্দ ও ঘুঙুরপরা দেবদাসীদের নৃত্যের শব্দ

কালাচাঁদের কানে এলো। কালাচাঁদ বিস্মিত হল না। এটা জগন্নাথদেবের লীলাখেলার সময়। কালাচাঁদ চোখ মুদল। লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে প্রার্থনা শুরু করল।

সাতদিন সাতরাত্রি বিশ্বজগতের সবকিছু ভুলে তনু-মন-প্রাণ দিয়ে কালাচাঁদ জগন্নাথদেবকে ডাকল। প্রার্থনা করল, যদি সে না জেনে কোন অপরাধ করে থাকে দেবতা যেন তাকে ক্ষমা করেন। ঈশ্বর তাকে পুরোহিতদের রোষানল থেকে রক্ষা করুন। সমাজপতিদের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করুন। তাকে শান্তি দিন, স্বস্তি দিন, স্থৈর্য দিন। দেবতার প্রত্যাদেশের জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে কালাচাঁদ মন্দির দালানে শুয়ে রইল। সাতদিন সাত রাত্রি একভাবে কেটে যাবার পর কালাচাঁদ উঠে দাঁড়াল। অনাহারে, অনিদ্রায়, কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট, দুর্বল তার দেহ। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, জিব শুকিয়ে গেছে, বিবর্ণ তার মুখমণ্ডল। একটি থাম ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কালাচাঁদ। চোখ মেলতেই আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল একদল মারমুখী পাণ্ডা তাকে ঘিরে ধরেছে

কালাচাঁদের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠল। পাণ্ডাদের কঠিন এবং অমিত্রসুলভ মুখগুলি ও রোষকষায়িত চক্ষু দেখে কালাচাঁদ বুঝল কোন অমঙ্গল আসন্ন। কালাচাঁদ গর্ভগৃহের দিকে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল। ছোট দরজাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। ষাঙ্গাড়েগুলির দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদ ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, আপনারা কি গর্ভগৃহের দরজাগুলি বন্ধ করেছেন?

—হ্যাঁ, চন্দা থেকে আগত এক ব্যক্তির কাছ থেকে আজ আমরা তোমার সব খবর পেয়েছি। তুমি মুসলমান নারী বিবাহ করেছ—তুমি হিন্দু ধর্মচ্যুত এক বিধর্মী। এ মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে কথাগুলি বললেন ব্রজেশ্বর স্বামী। ব্রজেশ্বর স্বামী পুরী জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

—আমি কোন বিধর্মী নই—আমি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণ।

তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল কাঁলাচাঁদ।

—একদা তুমি ব্রাহ্মণ অবশ্যই ছিলে কিন্তু আজ আর তা তুমি নও। যে মুহূর্তে তুমি মুসলমান রমণী বিবাহ করেছ সেই মুহূর্তেই তুমি ধর্মচ্যুত হয়েছ!

—কি করে?

—হিন্দুধর্মে বিধর্মীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কেউ কোন বিধর্মীকে বিবাহ করে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ ধর্মচ্যুত হবে।

—আমি একথা মানি না

—মানতে হবে।

—আমি তোমাদের কাছে আসিনি—আমি মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে এসেছি

—একই কথা। আমরা এই মন্দিরের পুরোহিত।

—তোমরা আমার মুক্তির পথ বন্ধ করে দিতে চাও?

—তুমি দেবদ্রোহী, ম্লেচ্ছ, ধর্মচ্যুত, তোমার কোন মুক্তি নেই। তোমার পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

—মিথ্যা কথা। আমি বিশ্বাস করি জগন্নাথদেব আমাকে ঠেলবেন না—আমি কোন পাপ করি নি—অন্যায় করি নি, তবে আমার শুদ্ধি হবে না কেন? মুক্তি হবে না কেন?

—জগন্নাথদেবের ইচ্ছা নয় তোমার মত একজন কদাচারী ধর্মত্যাগীর মুক্তি হোক

তীব্র ক্রোধ দমন করে কালাচাঁদ বলল, ঈশ্বর বলেছেন শাস্ত্রজ্ঞ নয় —যে আমায় বিশ্বাস করে, ভক্তি করে সেই আমার প্রিয়। সেই আমার কৃপাভাজন।

পুরোহিতেরা হো হো করে হেসে উঠল। কালাচাঁদ রাগে ও অপমানে উত্তেজিত হয়ে উঠল। পুরোহিতেরা কালাচাঁদকে উপহাস করতে এসেছে, প্রমাণ করতে এসেছে সে ধর্মচ্যুত। সে জাতিচ্যুত। সে অ-হিন্দু!

—তুমি মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দির অপবিত্র করেছ। চতুর্ভুজ বললেন। চতুর্ভুজ মন্দিরের একজন প্রবীণ পাণ্ডা।

—আমি বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, উপবীতধারী উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণ। গম্ভীর কণ্ঠে কালাচাঁদ বলল।

—একদিন অবশ্য তুমি সত্যিই তাই ছিলে কিন্তু আজ তুমি জাতিচ্যুত, ধর্মচ্যুত, এক ম্লেচ্ছ ও পতিত।

যোগরাজ বললেন। মন্দিরের আর এক প্রবীণ পুরোহিত যোগরাজ।

—তোমার কাছে হতে পারি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নই।

ঈশ্বর আমাকে কৃপা করেছেন। দেবতার কৃপা জাতি-কুল নাহি মানে। কালাচাঁদ একটি শ্লোক আবৃত্তি করল।

—শ্লোক আবৃত্তি করলেও কোন লাভ হবে না কালাচাঁদ। তুমি অপবিত্র এবং ভ্রষ্টাচারী। গম্ভীরমুখে ব্রজেশ্বর স্বামী বললেন।

—কে কাকে অপবিত্র করেছে? কিভাবে আমি অপবিত্র হয়েছি? রাগে ফেটে পড়ল কালাচাঁদ।

—আমরা এখানে তোমার সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে আসিনি। আমরা চাই তুমি এখান থেকে এই মুহূর্তে দূর হয়ে যাও। যদি না যাও তাহলে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব। আর একটি কথাও নয়। একটি মুহূর্তও নয়।

কালাচাঁদের মাথা ঘুরতে লাগল। সে জোর করে মন্দিরের স্তম্ভ আঁকড়ে ধরল। তার মুখ অপমান আর বেদনায় লাল হয়ে উঠল। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে গেল। সে পাণ্ডাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা আমার সামনে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমার সামনে দেবতার ঘরে তালা দিলে। বেশ আমি চললাম।

—ভাগো ভাগো—

মারমুখী পাণ্ডারা তারস্বরে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

—আমি যাচ্ছি কিন্তু আবার আমি আসব। প্রার্থনা করতে নয়, ভিক্ষা করতে নয়, শান্তির বার্তা নিয়ে নয়—তরবারি আর আগুন নিয়ে আসব। এই মন্দির আমি ধ্বংস করব—তোদের প্রত্যেককে আমি নির্মমভাবে হত্যা করব। জ্বালিয়ে দেবো উড়িষ্যা—জ্বালিয়ে দেবো মন্দির তোদের গুঁড়িয়ে দেব যত সব বকধার্মিকের আস্তানা—

পাণ্ডারা ঘৃণাভরে হেসে উঠল।

—যা যা অন্য জায়গায় গিয়ে আস্ফালন কর। মুসলমানের পাঁচাটা কুত্তা—শালা হারামজাদা—

পাণ্ডাদের উপহাস কালাচাঁদের হৃদয় বিদ্ধ করল। এক অকথ্য ভাষায় কালাচাঁদ একটা শপথ উচ্চারণ করল। তারপর সে ধীরপথে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেক দূরে চলে গিয়েও কালাচাঁদ পিছন থেকে পাণ্ডাদের অট্টহাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

॥ পাঁচ ॥

কালাচাঁদ আর ভাদুড়িয়ায় ফিরে গেল না। সেখানে গিয়ে সে তার আত্মীয়স্বজনকে কি বলবে? সমাজপতিদের কি বলবে? কি করে বলবে যে সে অপমানিত হয়েছে। ধিকৃত হয়েছে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কি করে বলবে পাণ্ডারা তাকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে? হয়ত বা ভাদুড়িয়ার লোকেরা ইতিমধ্যে এসব সংবাদ জেনে গেছে। যেমন ভাবে পুরীর পাণ্ডারা তার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল। কুসংবাদ দ্রুতগামী। কালাচাঁদ আর ভাদুড়িয়ায় ফিরে গেল না।

ক্ষমাহীন দুর্দশার মূর্তি নিয়ে তন্দায় ফিরে এলো কালাচাঁদ। অন্তরে প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রতিশোধের বাসনায় অস্থির হয়ে উঠল কালাচাঁদ।

দুলারী দূর থেকে স্বামীকে আসতে দেখে ছুটে এল। স্বামীকে জড়িয়ে ধরল।

—ওরা আমায় ত্যাগ করেছে দুলারী।

ভগ্নকণ্ঠে কালাচাঁদ দুলারীকে বলল।

—আমি আমার প্রেম দিয়ে তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবো স্বামীন।

—ওরা বলল আমি ধর্মচ্যুত, আমি যা কিছু স্পর্শ করব সবই নাকি অপবিত্র হয়ে যাবে। আজ আর আমি হিন্দু নই—মুসলমানও নই। আমি কি বলতে পার দুলারী?

—তুমি হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ। মানুষই যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে। তুমি আমার স্বামী—

—ওরা আমার অনেক নতুন নাম দিয়েছে দুলারী। আমি কালাচাঁদ রায় নই—আমি ধর্মত্যাগী, দেবদ্রোহী, জাতিচ্যুত, এক বিশ্বাসঘাতক।

দুলারী কালাচাঁদকে সান্ত্বনা দেয়। ভালবাসা দিয়ে সে ভুলিয়ে দিতে চায় তার অপমানের সব জ্বালা। স্বামীর মর্ম বেদনা দুলারীকেও বেদনার্ত করে তোলে। তার জন্যই তো কালাচাঁদের জীবনে ঝড় উঠেছে। দেবতার দুয়ার রুদ্ধ হয়েছে। অবস্থা যে এতদূর গড়াবে দুলারী কল্পনাও করতে পারেনি। সে কালাচাঁদকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কালাচাঁদ সুখী হলে সেও সুখী হবে। কালাচাঁদ দুঃখ পেলে সেও দুঃখ পাবে।

দুলারী স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সময় দাও, ওরা এসব ভুলে যাবে। কিছুদিন পরে দেখবে সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তখন তুমি আমি দুজনেই হিন্দু।

—দুলারী তুমি এদের জান না তাই একথা বলছ। তুমি জান না এই ব্রাহ্মণ সমাজপতিগুলো কি সাংঘাতিক লোক। তুমি পাথর গলাতে পারবে কিন্তু এই পাণ্ডাদের মত পরিবর্তন করতে পারবে না। এরা যেমন গোঁড়া, তেমন পাজি।

—আমরা মানুষের ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকব—হিন্দু-মুসলমান হয়ে নয়।

—কালাচাঁদ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দুলারী একদা, আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম কিন্তু আজ আর আমার কোন জাত নেই। আজ আমি ম্লেচ্ছ।

দুলারী তার হাত দিয়ে কালাচাঁদের মুখ বন্ধ করে দিল।

—স্বামিন্ তুমি এসব কথা বলবে না। তুমি অকারণে নিজেকে ছোট করছ। তুমি উত্তেজিত হয়েছ। তুমি ধৈর্য্য ধর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হবে না, দুলারী, হবে না।

মাথা নাড়ল কালাচাঁদ। কি করে সে দুলারীকে বোঝাবে বীণার যে তার ছিঁড়ে গেছে সে তার জোড়া লাগবে না?

কালাচাঁদ সুলতানের সঙ্গে দেখা করল।

আমি তোমার সমস্যার কথা শুনলাম কালাচাঁদ।

তাঁর কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

—জাঁহাপনা, আমি অপদস্থ হয়েছি, অপমানিত হয়েছি, তিরস্কৃত হয়েছি। জীবনে কখনও আমি এমনভাবে অপমানিত হইনি। ওদের বিদ্রূপ ও ঘৃণা এখনও আমাকে কাঁটার মত বিদ্ধ করছে। আমি এর বদলা নেব।

—এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে তুমি প্রতিহিংসার কথা ভাবছ কেন কালাচাঁদ? এ উত্তম কথা নয়। আমি অনুভব করছি তোমার অন্তর আহত হয়েছে কিন্তু সময় তোমার ক্ষত শুকিয়ে দেবে।

—কখনই নয়। আমি আপনার অনুগ্রহ চাই সুলতান।

—সুলতানের সব অনুগ্রহই তোমার প্রাপ্য কালাচাঁদ। কিন্তু তুমি কি কিছু চাও?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা?

—তুমি কি চাও?

আমি মুসলমান হতে চাই।

—কি? কি বললে! চমকে উঠলেন সুলতান।

—আমি ধর্মান্তরিত হতে চাই সুলতান।

সুলতান কালাচাঁদকে ভালবাসেন। কালাচাঁদ তাঁর জামাতা। উজিরই তাঁকে কালাচাঁদকে ধর্মান্তরিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর কালাচাঁদের ধর্মমত নিয়ে তিনি এতটুকুও ভাবেন নি। তাছাড়া সুলতানের মন থেকে হিন্দুবিদ্বেষ চলে গিয়েছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি অনেক মহৎ গুণ দেখতে পাচ্ছিলেন।

কালাচাঁদ আবার বলল, আমি মুসলমান হতে চাই। আপনি আমায় সাহায্য করুন জাহাঁপনা।

—তুমি কি দুলারীকে একথা জানিয়েছ?

—না। সব ব্যাপার নিয়ে আমি মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করি না।

—তুমি স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে চাইলে বাধা কোথায়? যে কোন মুসলমান যে কোন ব্যক্তিকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করতে পারে। কিন্তু তুমি ওইভাবে হবে না। পরিপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই তোমায় ইসলাম করা হবে। আমি তোমার জন্যে কাজি আতাউল্লা খাঁনকে ডেকে পাঠাব।

—আমি স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে চাই মনে হচ্ছে আপনি যেন একটু বিচলিত বোধ করছেন?

—হাঁ, মানে আমি তোমার বিবাহের পর একথা কখনও ভাবি নি। এটা যে ভাবার বিষয় তা আমার মনে হয় নি।

—কিন্তু এখন এটা আমার জীবনে সবচেয়ে জরুরী বিষয় জাহাঁপনা।

—ইনসা আল্লা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

একথা শুনে উজির উত্তেজিত হল। কাজী হতবাক হল। যে

ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করতে অস্বীকার করার জন্য প্রাণ দিতে যাচ্ছিল সে নিজে থেকে স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে চায় ? তাজ্জব কা বাত !

এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে আমীর ওমরাহের সামনে কালাচাঁদ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল।

তার খতনা করা হল। রক্তবন্ধ হলে কালাচাঁদকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসল করানো হল। তারপর কাজীর সামনে এসে বসল।

—তুমি মুসলমান হতে চাও ? কাজী জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ।

—স্বেচ্ছায় ?

—হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে তিনবার কলমা পড়। প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণ করবে স্পষ্ট করে এবং ধীরে ধীরে।

কালাচাঁদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

—লা আল্লা ইলল্লা মহম্মদ উর রসুল আল্লা······এর অর্থ, তুমি বিশ্বাস কর ঈশ্বর এক, তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই আর মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর। কাজী ব্যাখ্যা করলেন।

—তুমি তোমার হিন্দু নাম পরিবর্তন করতে চাও ?

—হ্যাঁ চাই।

—কোন বিশেষ নামের কথা তুমি ভেবেছ ?

—ভেবেছি। মহর্ম্মদ ফারমূলী।

—বেশ তাই হবে। আজ থেকে তোমার নাম হল মহম্মদ ফারমূলী। তুমি প্রার্থনা করতে শিখবে। একে নমাজ বলে। পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ করে দিনে পাঁচওয়াক্ত নমাজ পড়বে। সকালের নমাজ 'ফজর'। তারপর 'জুহারের' নমাজ, তারপর 'আসারের' নমাজ, তারপর 'মাগরিবের' নমাজ, সবশেষে রাত্রে 'ঈশার' নমাজ। মহম্মদ ফরমূলী এখন তুমি পরিপূর্ণ মুসলমান।

কালাচাঁদ কার্পেট ছেড়ে উঠে বসে কাজীকে দীর্ঘ সালাম দিল।

সুলতান মহম্মদকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি ভাল নামই বেছে নিয়েছ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস তুমি অচিরে একজন ইমানদার সাচ্চা মুসলমান হবে।

—ধন্যবাদ জাহাঁপনা।

কালাচাঁদের সঙ্গে দুলারীর দেখা হল।

—তুমি কি উন্মাদ হয়েছ স্বামিন?

—একথা কেন দুলারী?

—কি দরকার ছিল তোমার মুসলমান হওয়ার?

—দরকার নিশ্চয়ই ছিল দুলারী। আমি ধর্মের আশ্রয় চাই। হিন্দুরা আমায় পরিত্যাগ করেছে। মুসলমানেরা আমায় আশ্রয় দিয়েছে, নৈতিক সমর্থন দিয়েছে। মুসলমান হয়ে এখন আমি ইসলামের আশ্রয় পেলাম।

—সাচ্চা মুসলমান হওয়া সহজ নয়।

—আমি সবে মুসলমান হয়েছি। আমায় তৈরী হতে সময় দাও।

—আমার মন অন্য কথা বলছে।

—কি বলছে দুলারী?

—ধর্মের আশ্রয় তোমার একটা ছল—একটা ছদ্মবেশ—

—কি সব বলছ দুলারী?

—সত্যি করে আমার গা ছুঁয়ে বলতো মুসলমান হওয়ার পিছনে তোমার কোন গূঢ় মতলব নেই? ধান্ধা নেই? কোন দুরভিসন্ধি নেই?

—আমার কোন মতলব নেই দুলারী। তুমি সব মিথ্যে মিথ্যে কল্পনা করছ।

—স্বামী, আমি একজন নারী। নারীর স্বাভাবিক অনুভূতিশক্তি বলছে এই ধর্মান্তরিত হওয়ার পিছনে তোমার কোন অশুভবুদ্ধি কাজ করছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস তুমি হিন্দুদের ওপর প্রতিহিংসা

নেবার জন্যে ধর্মান্তরিত হয়েছ। আমার আশঙ্কা তোমার অভিমান মারাত্মক ক্রোধানলে জ্বলে উঠবে।

—তুমি বড় বেশী অবান্তর প্রশ্ন কর দুলারী। তোমার সব কথা আমার ভালো লাগে না।

—সত্যি কথাটা শুনতে এত ভয় কিসের? আমি বুঝতে পেরেছি তুমি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছো। আমি জানি না সে আগুনে তুমি কত মানুষকে পোড়াবে। আমার বড় ভয় হয়।

—দুলারী অনর্থক তুমি নিজেকে আমার কাছে অপ্রিয় করে তুলছ। আমি এসব কথাবার্তা পছন্দ করি না। আমি মহম্মদ ফরমূলী একজন মুসলমান। আমি সৎ এবং সাচ্চা মুসলমান হব। আমি নমাজ শিখব, কোরাণ পড়ব। তুমি আমায় সাহায্য করবে দুলারী।

দুলারী ছল ছল চোখে কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই করব স্বামিন।

॥ ছয় ॥

ভাদুড়িয়া গ্রামে সংবাদ এসে পৌঁছল কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছে। গ্রামের পুরোহিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে জমায়েত হয়ে বলাবলি করতে লাগল, দেখলে তো কি বলেছিলাম। কালাচাঁদ আগেই মুসলমান হয়েছিল, এখন সেটা প্রচার করা হচ্ছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ অসহ্য রাগে এবং দুঃখে গোংরাতে লাগলেন। রূপালী ও রূপানী তাদের বুক চাপড়ালো, চুল ছিড়ল, বিধবার মত হা-হুতাশ করে কাঁদতে লাগল। ইন্দুবালা দেবী বিরক্ত হয়ে স্থানান্তরে ভাদুড়িয়া ত্যাগ করে কাশীবাসী হবার মনস্থ করলেন। রূপালীও তাকে নিয়ে যাবার জন্যে ইন্দুবালাকে অনুনয় করল। বন্দনাদেবী এতবড় আঘাত সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন।

ভাতুড়িয়া গ্রামে একটি পরিবারের মৃত্যু হল। ভাতুড়িয়ার দরজা কালাচাঁদের কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন, কালাচাঁদ রায় বংশের কুলাঙ্গার। তার সঙ্গে এই বংশের আর কোন সম্পর্ক রইল না। সে আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল।

—হা ভগবান! ইন্দুবালাদেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

—আমার মৃত্যু হলে এ অবস্থা আর দেখতে হত না।

—তারপর নিজের শীর্ণ হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই হাত দিয়ে আমি কালাচাঁদকে মানুষ করেছি। এই নোংরা মলিন ঘৃণিত হাত দুটো আমি কেটে ফেলব।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটা রামদা তুলে নিলেন।

রূপালী ও রূপানী দাদুর কাছে ছুটে এলো।

—দাদু তুমি মরলে কে আমাদের দেখবে? আমরা কোথায় যাব?

—জ্ঞানেন্দ্রনাথ থামলেন।

রূপালী বলল, আমাদের মুক্তির এক পথ ছিল সতী হওয়া। কিন্তু আমাদের স্বামী মারা যায় নি—আমরা সতী হই কি করে? আমরা তাঁর কাছে যেতেপারি না কারণ তাহলে সমাজ আমাদের ত্যাগ করবে।

বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, হতভাগা পাণ্ডা! ওই পাজি শয়তানগুলোর জন্যেই আজ আমাদের ছেলে পর হয়ে গেল। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন, এই মুহূর্তে আমি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।

এই বলে বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ উপবীতটা গলা থেকে খুলে দু'হাত দিয়ে ছিঁড়ে সবেগে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। তারপরই অসহ্য মনোবেদনায় মূর্চ্ছা গেলেন।

*   *   *   *

মহম্মদ ফরমূলী একদিন সুলতানকে বললেন, অনেকদিন হল

অলসভাবে বসে আছি, কোন কাজ কর্ম নেই। আমি কাজ চাই।

—কি কাজ চাও মহম্মদ?

—আপনি কি কোন দেশজয়ের কথা ভাবছেন না? কোন অভিযান?

সুলতান মাথা নেড়ে বললেন, না।

—জয় করার আর কি আছে মহম্মদ?

—কেন উৎকল?

—অসম্ভব! অসম্ভব! রাজা মুকুন্দদেব আমায় দুবার পরাজিত করেছে। অত্যন্ত চতুর এবং বলবান সে। উৎকল আক্রমণ করা স্রেফ মূর্খামী ছাড়া আর কিছুই হবে না।

—আর একবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি? আমায় একদল সেনা দিন। আমি একবার রাজা মুকুন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি।

—উৎকল রাজ্যের প্রতি লোভ সুলতানের বহুদিনের। সে জন্যে তিনি দুবার উৎকল আক্রমণ করেছিলেন। মহম্মদের প্রস্তাবে তাঁর পুরানো লোভটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাছাড়া রাজা মুকুন্দকে সায়েস্তা করাও দরকার। সুলতান অনেকক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। তারপর বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, উৎকল আক্রমণ করতে পার। সৈন্যসামন্ত যা চাও সবই পাবে। কিন্তু পরে যেন অভিযোগ কর না যে আমি তোমায় সতর্ক করে দিই নি।

মহম্মদ ফারমূলী ক্ষিপ্ত হাসি হাসল।

বিরাট এক সৈন্যদল সুসজ্জিত হল। এক বিরাট অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মহম্মদ ফারমূলী উড়িষ্যার পথে চলল।

রাজা মুকুন্দদেব উড়িষ্যার অধিপতি। তার রাজধানী জাজপুর। তিনি বৃদ্ধ হলেও বাহুবল হারান নি। তিনি শুনতে পেলেন সুলতান সুলেমান কররাণীর জামাতা এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মুকুন্দদেব হেসে প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের দিকে চেয়ে বললেন।

—দু-দুবার হেরেও পাঠানের শিক্ষা হয় নি। এখন মহম্মদ ফারমূলী নামে এই ভুইফোঁড়কে পাঠাচ্ছে। বেটাকে একটা উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিতে হবে। আসুক সে।

—মহম্মদ ফারমূলী একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু মহারাজ।

—ধর্মোদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, ঘৃণ্য, দেবতার ক্রোধে তার বিনাশ অনিবার্য। বিশ্বনাথ, আমরা তাকে শুধু পরাজিতই করব না—আমরা তাকে হত্যা করব। যতবারই দয়া পরবশে এই মুসলমানদের ছেড়ে দিয়েছি ততবারই তারা পুনরায় আক্রমণের সুযোগ নিয়েছে। এই দুষ্ট ক্ষতের মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন। আপনি, অবিলম্বে সৈন্যদলকে প্রস্তুত করুন।

—যে আজ্ঞা, মহারাজ।

—শীঘ্রই যুদ্ধ শুরু হবে। রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করুন।

মহম্মদ ফারমুলী উড়িষ্যার সীমান্তে এসে দেখলেন এক বিরাট হিন্দুসেনার দল পথ অবরোধ করে রয়েছে।

জাজপুরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হল। মহম্মদ ফারমুলী অসাধারণ বীর যোদ্ধা। তার বীরত্ব দেখে হিন্দু সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়ল। এ যেন এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করা। হিন্দু সেনারা যথেষ্ট বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করলেও প্রতিহিংসা পরায়ণ ধর্মত্যাগীর ক্ষাত্র তেজের সঙ্গে পেরে উঠল না। অশ্বারোহী রাজা মুকুন্দ তরবারি নিয়ে মত্ত হাতীর মতো মুসলমান সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অসংখ্য মুসলমান সৈন্য হত্যা করে তিনি এগিয়ে চললেন।

অপর দিকে মহম্মদ ফারমুলী হিন্দু সেনাদের কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্ক। তার কাছে এসে কোন হিন্দু সেনা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারল না। যুদ্ধ করতে করতে রাজা মুকুন্দ ও মহম্মদ ফারমুলী পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে পড়লেন।

এই অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা সামনাসামনি হল। দুজনের দেহ

এবং পোষাক রক্তাক্ত। তারা দুজনে দুজনের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করল। 'আল্লা হু আকবর' বলে মহম্মদ তীর বেগে ছুটে গেল রাজা মুকুন্দের প্রতি। অপরদিক থেকে 'জয় মা ভবানী' বলে তরবারী উঁচিয়ে ছুটে গেলেন মুকুন্দদেব। দীর্ঘ সময় ধরে চলল দ্বৈরথ সমর। মনে হল যেন দুটি মত্ত হস্তী মাটি কাঁপিয়ে দাপাদাপি করছে। মুকুন্দদেব যত বড় বীরই হোক, তিনি বৃদ্ধ। মহম্মদ ফারমুলী নৌজোয়ান। যুবক। তার বীরত্ব, তার শক্তি বৃদ্ধের তুলনায় স্বভাবতই অনেক বেশী। দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করার পর বৃদ্ধ মুকুন্দদেব অবসন্ন হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। মহম্মদ তরবারির এক কোপে তাঁর মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর তরবারির ডগায় ছিন্ন মুণ্ডু তুলে ধরে চিৎকার করে বলল।

—রাজা মুকুন্দ নিহত হয়েছে।

চারদিকে চিৎকার, সোরগোল উঠল। রাজা মুকুন্দের ছিন্ন মুণ্ড দেখে ভীত হয়ে হিন্দু সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। অস্ত্র ফেলে দিয়ে তারা যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

মহম্মদ ফারমুলি ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়ে দিল।

উড়িষ্যা মুসলমানদের পদানত হল।

* * *

সোলেমান কররানি যা করতে পারেন নি মহম্মদ ফরমুলী তাই করল। বলতে গেলে অসাধ্য সাধন। উড়িষ্যা সুলতানী শাসনের আওতায় এল। জাজপুর পার্বতীর মন্দিরের জন্যে বিখ্যাত। দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তবৃন্দ সেখানে দেবীদর্শন করতে আসে। মহম্মদ রাজধানীতে ঢুকেই আদেশ দিলো, পার্বতীর মন্দির ধ্বংস করে দাও।

মহম্মদ হিন্দুদের ক্ষমা করবে না। দেবদেবীকে রেহাই দেবে না। কোন মন্দির আস্ত রাখবে না। মহম্মদের আদেশে সেনারা লৌহ মুদ্গর দিয়ে মন্দির ভেঙ্গে দিল। সৈন্যদের দিকে চেয়ে মহম্মদ বলল, তোমরা শুধু মন্দির ভাঙ্গবে কিন্তু দেববিগ্রহ ধ্বংস করবে না।

ও কাজ আমি স্বহস্তে করব। মুসলমান নয়—হিন্দুর মন্দির হিন্দুই ধ্বংস করবে।

মহম্মদ ফারমুলী নেটা। বাঁ হাতে লৌহমুদ্গর তুলে নিয়ে সে ভবানীর মূর্তিতে আঘাত করল। মূর্তির ডান দিকটা ভেঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে গেল। তারপর মহম্মদ সেটাকে বাঁ হাত দিয়ে দূরে ধূলায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

প্রতিহিংসা। প্রতিশোধ। আক্রমণ। এই তো সবে শুরু। তামাম হিন্দুস্তান জ্বলবে। সব মন্দির-দাউ দাউ করে পুড়বে। দেববিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে নেটা কালাচাঁদের প্রেতাত্মা হা হা করে পৈশাচিক হাসি হাসবে।

মহম্মদ সৈন্যদের আদেশ দিল, যত বেশী হিন্দুকে পার মুসলমান কর। যারা মুসলমান হতে রাজী হবে না, তাদের নির্বিচারে হত্যা কর।

জাজপুর নিশ্চিহ্ন হল। সেখানে একটা ধ্বংস স্তূপের সৃষ্টি হল।

—আমরা কি এবার তন্দায় ফিরে যাব জনাব?

ফৌজদার নুরুল হাসান জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। আমরা আরও দক্ষিণে যাব। আমরা যাব পুরী। —সেখানে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে সেটাকে ধ্বংস করতে হবে। সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। সেখানকার প্রত্যেকটি পাণ্ডাকে হত্যা করতে হবে।

—জনাব!

নুরুল হাসান আদেশ শুনে বিচলিত বোধ করলেন।

—এ আমার আদেশ নুরুল হাসান।

সেনাপতির আদেশ মানতে ফৌজদার বাধ্য। অন্যায় বলে মনে হলেও তার কিছু করার নেই।

বিজয়ী মুসলমান সেনাবাহিনী রণদামামার ছন্দে পা ফেলে এগিয়ে চলতে লাগল পুরীর পথে। সঙ্গে সঙ্গে চলল ধর্মান্তর—

করণ, হত্যা, লুণ্ঠন এবং হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশ। যে পথ দিয়ে সৈন্যরা মুসললান গেল সে পথের দুধার শ্মশানে পরিণত হল। পুরীর অধিবাসীরা রাজা মুকুন্দদেবের পরাজয়ের সংবাদ পেয়েছিল কিন্তু তারা ভাবতে পারেন নি যে মুসলমান সৈন্যরা পবিত্র তীর্থভূমিতে আসবে। পুরী নগরীর কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। যখন তারা জানতে পারল যে সুলতানী সেনারা রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করে পুরীর দিকে এগিয়ে আসছে, প্রথমে তারা একথা বিশ্বাসই করতে পারেনি। সব বলাবলি করতে লাগল, এই মুসলমানগুলো কি অদ্ভুত জীব! জগন্নাথদেব জাগ্রত দেবতা। তারা কি একথা জানে না? তারা জানে না অপবিত্র ম্লেচ্ছরা নগরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যাবে? জগন্নাথদেবের গায়ে হাত দেয়, তাঁর ক্ষতি করে এত ক্ষমতা এত সাহস কার আছে পৃথিবীতে?

বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অশ্বারোহী মহম্মদ ফারমূলি পুরীর মন্দিরের সিংহদরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল। হায়নার মত বীভৎস হাসি হাসল মহম্মদ। সরিসৃপের মত তার জিবটা লকলক করে উঠল। প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, ইন্তেকাম। আদিম মানুষের হিংস্র প্রতিহিংসায় টগবগ করে ফুটে উঠল মহম্মদের ধর্মান্তরিত হিন্দু রক্ত। বিড়বিড় করে সে বলল, তোমরা আমায় মুসলমান করেছ, আমি এবার তার বদলা নেব। মুসলমান মন্দিরে ঢুকবে। হিংস্র হায়নার রক্তাক্ত নখদন্ত বেরিয়ে আসবে। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে মহম্মদ বলল, পাণ্ডাদের মারবে না, আমার কাছে বেঁধে নিয়ে আসবে। অন্য যাদের দেখবে তাদের তৎক্ষণাৎ হত্যা করবে। মন্দির চূর্ণ করে দাও। দরজায় দরজায় আগুন লাগিয়ে দাও। জ্বালিয়ে দাও শহর।

মহম্মদ পুরীর দিকে আসছে শুনে বহু লোক নগর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। বহু ভীত নারী তাদের শিশুপুত্র ও অলঙ্কার সমেত মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমান সৈন্যরা মন্দিরে ঢুকেই

মন্দির অপবিত্র করল। শতশত ভীত নারী ও শিশুকে বন্দী করল। শিশুদের হত্যা করল, নারীদের উপর সৈনিকেরা ক্ষুধিত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সতীত্ব নাশ করল। তাদের পৈশাচিক অত্যাচারে অনেক মেয়েরই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল। যে সব লোক মন্দিরে, ছিল যে সব তীর্থযাত্রী পূজা দেবার জন্যে মন্দিরে গিয়েছিল, যেসব দেবদাসী সেখানে থাকত তাদের সবাইকে একে একে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। রক্তের নদী বয়ে সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ে পুরীর সমুদ্রের নীল জলরাশিকে লাল করে দিল।

মহম্মদ বামহাতে মুদ্গার দিয়ে একশো কুড়িটি মূর্তির ডান দিকগুলি স্বহস্তে চূর্ণ করে দিল। তারপর সেগুলিকে নোংরা জায়গায় ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিল। এরপর মহম্মদের আদেশে পুরীর মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। লেলিহান অগ্নিশিখায় পুরীর মন্দির জ্বলতে থাকল। জাগ্রত জগন্নাথ নির্বাক হয়ে পুড়তে থাকলেন।

—প্রত্যেকটি হিন্দু ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেছে জনাব। কেউই মুসলমান হতে চায় না।

নরুল হাসান মহম্মদকে জানাল।

—তাদের কি করা হয়েছে ?

—প্রত্যেককেই হত্যা করা হয়েছে জনাব।

—উত্তম। পাণ্ডাগুলো কোথায় ?

—তাদের বন্দী করে একটা কুঠুরীর মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে।

—চলুন আমি তাদের দেখব।

যে ঘরে পাণ্ডাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল কালাচাঁদ সেখানে এসে হাজির হল। কালাচাঁদ পাণ্ডাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠল।

—আমাকে চিনতে পারিস ? ভালো করে দেখ।

ব্রজেশ্বর স্বামীর সামনে এসে কালাপাহাড় তার মুখে তরবারির খোঁচা দিয়ে বলল।

ব্রজেশ্বর স্বামী ভালো করে তাকাল। অস্ফুটস্বরে বলল, তোমার মুখটা চেনাচেনা বলে মনে হচ্ছে।

—শালা, চিনতে পেরেছিস তাহলে? একবছর আগে আমি তোদের কাছে এসেছিলাম। মনে আছে সেই ধর্মচ্যুত, জাতিচ্যুত মুসলমানের পা চাঁটা কুত্তাকে?

—কালাচাঁদ রায়? তুমি সেই কালাচাঁদ রায়?

—হ্যাঁ সেদিন আমি কালাচাঁদ রায় ছিলাম। আজ আমি মহম্মদ ফারমুলি। সেদিন যে তোদের কাছে এসেছিল সে হিন্দু আজ যে এসেছে সে মুসলমান। সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি আবার আসব। তাই আমি এসেছি। ব্রাহ্মণের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নয়—মুসলমানের তরবারি আর কেরাণী নিয়ে।

—তুমি মন্দির চূর্ণ করেছ। বিগ্রহ অপবিত্র করেছ, মহাপ্রভু তোমায় ক্ষমা করবেন না। তিনি তোমায় ধ্বংস করবেন। তুমি নির্বংশ হয়ে মরবে।

—আচ্ছা! তাই নাকি! তোর মহাপ্রভু মুক্তি দিতে পারে না। সে ধ্বংস করতে পারে? চেয়ে দেখ তোর নুলো জগন্নাথের ভাঙ্গা বিগ্রহ ধুলোয় গড়াচ্ছে।

—দেখলি তো, কে কাকে ধ্বংস করে?

কণ্ঠের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ সহসা পরিবর্তিত হয়ে গেল। জলদগম্ভীর-স্বরে কালাচাঁদ বলল, আজ আমার চোখে ঘৃণা আর প্রতিহিংসা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। একদা তুই আমাকে উপহাস করেছিলি—বিদ্রূপ করেছিলি—কুকুরের মত মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি। ধর্মচ্যুত করেছিলি। আজ আমি তার বদলা নেব। খুনকা বদলা খুন।

মহম্মদ নরুল হাসানের দিকে তাকাতেই ফৌজদার এগিয়ে এলো।

—বলুন জনাব।

—সৈন্যদের পঞ্চাশটা গর্ত খুঁড়তে বলুন। এই পাণ্ডাগুলোকে কাঁধ পর্যন্ত সেই গর্তে পুঁতে দিন।

আদেশ অনুসারে কাজ হোল।

মহম্মদ আকাশের দিকে তাকাল। মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর তাপ বিকিরণ করছে। মহম্মদ পাণ্ডাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোদের জগন্নাথের দয়ার উপর ছেড়ে দিলাম। দেখি কেমন করে ওই জগন্নাথ তোদের রক্ষা করে।

কাঁধ পর্যন্ত গর্তে প্রোথিত পাণ্ডারা করুণ নেত্রে মহম্মদের দিকে তাকিয়ে রইল।

—যতক্ষণ পর্যন্ত না তোরা আমার দয়া ভিক্ষা করিস ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে বসে রইলাম।

পাণ্ডারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে চলল। মাথার উপর দারুণ গ্রীষ্মের সূর্যের তাপে বালুকণা আগুণের হল্কা হয়ে উঠল। পাণ্ডাদের ঠোঁট ফাটতে লাগল, মুখের চামড়া সূর্য্যের তাপে পুড়ে তামাটে হয়ে গেল, সেখানে ফোস্কা পড়ল।

মহম্মদ দূরে বসে সে দৃশ্য দেখে পৈশাচিক উল্লাস উপভোগ করতে লাগল. দিন গেল, রাত্রি এলো। সমুদ্র গর্জন করে তীর ভূমিতে আছড়ে পড়তে লাগল। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা পাণ্ডাদের মুখে এসে পড়ল। তারা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়। কিন্তু তবুও মুসলমানের কাছে কাতরকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করল না।

পরের দিন পুরীর আকাশে প্রভাত সূর্য উঠল। যতই প্রহর বাড়তে থাকল সূর্যের তাপ বিকিরণ ততই প্রখরতর হতে থাকল। পাণ্ডাদের ঠোঁট ফেটে গেল। জিবগুলো আলগা হয়ে আস্তে আস্তে মুখের বাইরে চলে এলো। চোখগুলো মৃতের মত ভাবলেশহীন হয়ে গেল। এমন নৃশংস অত্যাচার তাদের অজানা ছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় পাণ্ডারা কাতরাতে শুরু করল। তারা আর থাকতে পারল না।

—দয়া কর কালাচাঁদ—একটু জল—

মহম্মদ হো হো করে অট্টহাস্য করে বলল, কালাচাঁদ কোথায়? সে মরে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে মহম্মদ ফারমুলি। কালাচাঁদ মরে

গেছে। এমনি করেই তোরা একদিন তাকে মেরে ফেলেছিস।

—দয়া কর কালাচাঁদ—ক্ষমা কর—

আমি কালাচাঁদ নই—আমি তার প্রেতাত্মা - মহম্মদ ফারমূলী। কালাচাঁদ হাসতে থাকে। পৈশাচিক প্রতিহিংসায় তার জিব সাপের জিবের মত লকলক করে ওঠল। রক্তের তৃষ্ণা তার এখনও মেটেনি।

নৃশংস অত্যাচার দেখে ফৌজদার নুরুল হাসান শংকিত হলেন। এতো বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মহম্মদের আচরণ তার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। মহম্মদ কি পাগল হয়ে গেছেন?

—নুরুল। মহম্মদ ডাকল।

—জনাব।

—ওদের চোখগুলো উপড়ে নিন।

—জনাব? নুরুল হাসান চম্‌কে উঠলেন।

—কি বলছি বুঝতে পাচ্ছেন না? এই পুরোহিতগুলোর চোখ উপড়ে নিন।

চিৎকার করে উঠল মহম্মদ।

আর কিছু বলার সাহস পেল না নুরুল। আদেশ অনুসারে কাজ হল। এক এক করে পঞ্চাশজন পাণ্ডার চোখ উপড়ে নেওয়া হল। অক্ষিকোটর থেকে রক্ত বার হল কিন্তু সূর্যের প্রখর তাপে অতি শীঘ্রই তা শুকিয়ে কালো হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে দেখা গেল পঞ্চাশজন পাণ্ডার সবারই মৃত্যু হয়েছে। ব্রজেশ্বর স্বামী সবার শেষে মারা যান। মারা যাওয়ার পূর্বে তিনি শয়তানের অট্টহাস্য শুনতে পান।

পুরীর ইতিহাসে কখন এমন দুর্ঘটনা ঘটে নি। এমন দুর্দিন আসে নি। মন্দির প্রাঙ্গণের মেঝে রক্তরঞ্জিত হয়ে গেল। প্রধান মন্দির ছাড়া আর সব মন্দির বিচূর্ণ হল বিধর্মীর পদাঘাতে কলুষিত হল দেবমন্দির। সারা নগর একটা বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। একটা মৃত মানুষের

পাহাড় গড়ে উঠল। কালো পোষাকে মহম্মদ একটা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তারস্বরে এক ভয়ংকর শপথ বাক্য উচ্চারণ করল—

—যে যেখানে আছ শোন—আমি কালাপাহাড় বলছি হিন্দুধর্মের শেষ চিহ্ন আমি ভারতবর্ষ থেকে মুছে দেব ; প্রত্যেকটা হিন্দুমন্দির আমি ভাঙ্গব, প্রত্যেকটা বিগ্রহ আমি বাঁহাত দিয়ে চূর্ণ করব। ধর্মান্তরিত না হলে প্রত্যেকটি হিন্দুকে আমি কুকুরের মত হত্যা করব। কালাপাহাড়ের রোষানলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে তামাম হিন্দুস্তান।

মহম্মদের সৈন্যরা সেনাপতি মহম্মদ ফারমূলীর এই কঠিন শপথবাক্য শুনল। তারাও কেমন যেন শংকিত হল। তারা শুনল, মহম্মদ বলে চলেছে—

—আজ থেকে আমি আমার রাজকীয় পোষাক পরিত্যাগ করে কালো পোষাক তুলে নিলাম। এটা ঘৃণা ও প্রতিহিংসার পোষাক—এটা মৃত্যুর সজ্জা। আমাকে দেখলে লোকে জানবে তার মৃত্যু শিয়রে।

পুরীর মন্দির ধ্বংস করে কালাপাহাড় সসৈন্যে চলল কোণারকের সূর্যমন্দিরের উদ্দেশ্যে। মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পর হিন্দুর মন্দির রক্ষা করার আর কেউ রইল না। কালাপাহাড় কোণারকের ছোট ছোট মন্দিরগুলি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দিয়ে দেবমূর্তিগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করল। কোণারক মন্দিরের দেওয়ালগুলি ২৫ ফুট চওড়া বিরাট শিলাখণ্ড দ্বারা নির্মিত বলে তা ভাঙ্গা কালাপাহাড়ের পক্ষে সম্ভব হল না। কিন্তু সে মন্দিরের কলস ও ধ্বজপদ্ম ভেঙ্গে দিয়ে আমলক শিলাকে স্থানচ্যুত করে দিল; কালাপাহাড় জানত আমলক শিলাকে সরিয়ে দিলে পার্শ্বচাপের ফলে মন্দির আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যাবে।

ফেরার পথে কালাপাহাড় ভুবনেশ্বরে এসে থামল। মন্দির নগরী ভুবনেশ্বর। একটি কম একলক্ষ মন্দির দিয়ে তৈরী এই মহানগরী। হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করে কালাপাহাড় তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে চলল।

দয়ানদীর তীরে এসে থমকে দাঁড়াল কালাপাহাড়। এখানেই একদিন

অজস্র মানুষের রক্তে নদীর জল লাল হতে দেখে চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিল। মানুষের রক্ত ও চোখের জল থেকে ঘটেছিল মহাজীবনের অভিযান। সেদিন অস্ত্র ত্যাগ করে এক পিতৃহন্তা রাজর্ষিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এই পবিত্র নদীকে সাক্ষ্য রেখেই অনন্তপুণ্য তিনি বুদ্ধকে স্মরণ করেছিলেন। ধর্মকে স্মরণ করেছিলেন। সংঘকে স্মরণ করেছিলেন।

কালাপাহাড় ঘোড়া থেকে নামল। তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে স্বগতোক্তি করলঃ দয়ানদী, আজ তোমার তীরে দাঁড়িয়ে আছে কালাপাহাড়—এমন একটি মানুষ যে শুধু হিংসা আর প্রতিহিংসার রোষানলে প্রতি মূহূর্তে অহরহ জ্বলছে। তোমার জল আজ আবার লাল হচ্ছে কলিঙ্গবাসীর রক্তে। কিন্তু তা দেখে ধর্মান্তরিত কালাপাহাড়ের পৈশাচিকতা কমবে না, এতটুকু অনুশোচনা আসবে না তার মনে। কালাপাহাড়ের দেহে যে মানুষটা ছিল তাকে হিন্দু পাণ্ডা পুরোহিতেরা গলা টিপে হত্যা করে সেখানে তার প্রেতাত্মা পিশাচকে বসিয়েছে। অশান্ত ঘূর্ণির মত ঝড় তুলে সে উড়িষ্যার সব তছনছ করে দিয়ে যাবে।

ইতিহাসে মহম্মদ ফারমূলি মৃত্যুদূতের কায়া নিয়ে কালাপাহাড় হয়ে বেঁচে থাকবে।

॥ সাত ॥

মহম্মদ ফারমূলি তন্দ্রায় ফিরে এলে সুলতান তাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন।

—তুমি আমার গর্ব মহম্মদ। কোন মুসলমান বাদশা আজ পর্যন্ত যা পারে নি তা তুমি করেছ। আমার জীবনের এটাই সবচেয়ে বড় অহংকার। সবচেয়ে বড় বিস্ময়। তুমি কি পুরস্কার চাও মহম্মদ ?

—আপনি আপনার সবচেয়ে বড় রত্ন আমায় দিয়েছেন জাঁহাপনা—আমার আর কিছু চাইবার নেই।

সুলতান ঠিকমত বুঝতে পারলেন না।

—আপনার আদরের কন্যা দুলারীকে দিয়েছেন। সেইতো আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

সুলতান আনন্দে মহম্মদের পিঠ চাপড়ালেন।

—আমার এতদিন দুই পুত্র ছিল—তুমি আজ থেকে আমার তৃতীয় পুত্র। আজ আমি আমার তৃতীয় পুত্র সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী গর্বিত।

—অনুমতি দিন জাঁহাপনা একটার পর একটা অভিযান করে সমগ্র হিন্দুস্থানকে আপনার পায়ের তলায় এনে দিই।

—তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তুমি পারবে মহম্মদ। তুমি যা করতে চাও কর। তোমাব সব কাজেই আমার সম্মতি আছে। তোমার জয়ে তোমারই গৌরব বাড়বে, আমার নয়। যে দেশ জয় করবে সে দেশ তোমার হবে। আমার আর অধিক ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু চায় সবই আমি পেয়েছি। আমার শুধু একটাই অভাব আছে—

মহম্মদ বুঝতে না পেরে সুলতানের দিকে তাকাল।

—আমার একটা নাতির অভাব কালাচাঁদ। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটা নাতির মুখ দেখতে চাই মহম্মদ।

—বেশ, কথা দিচ্ছি আপনার একটা নাতি হবে।

কিছুদিন পরেই মহম্মদ ভাদুড়িয়া আক্রমণ করল। উত্তর বাংলার একটা ছোট রাজ্য ভাদুড়িয়া। রাজা সমরজিৎ ভাদুড়ি খুবই দয়ালু কিন্তু দুর্বল রাজা। মুসলমান আক্রমণের সংবাদ শুনে তিনি প্রমাদ গুণলেন। কি করে এই আক্রমণ ঠেকানো যায় সেই চিন্তায় মগ্ন হলেন রাজা সমরজিৎ।

প্রধান পুরোহিত শ্রুতিপ্রসাদ বিচলিত হলেন, ভীত হলেন। এবার আর রক্ষা নেই। অন্যান্য পুরোহিতেরাও ভয় পেলেন। তারা পুরীর পাণ্ডাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা শুনেছেন। তাদের বেলায়ও ওর চেয়ে ভালো কিছু হবে না। কালাচাঁদকে তারাই প্রথমে একঘরে করেছিল, করেছিল ধর্মচ্যুত।

পুরোহিতেরা সব একত্রিত হয়ে বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

—দাদু, আপনি আমাদের বাঁচান। একমাত্র আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন। আপনি কালাচাঁদের সঙ্গে দেখা করে এ অভিযান ঠেকান; তা নাহলে ও দেশ ছারখার করে দেবে।

—বেশ তো দিক না। শান্তস্বরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন।

—দাদু আপনি আমাদের বাঁচান। আমরা বিপন্ন।

—তোমরাই তো এসবের মূল কারণ। ভর্ৎসনা করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

—এখন আর পুরানো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই।

—আছে। সেদিন যদি তোমরা বিবেচক হতে, মানুষের মত ব্যবহার করতে, যদি গোঁড়ামী না দেখিয়ে কালাচাঁদকে জাতিচ্যুত না করতে তাহলে আজ সে আমার পৌত্র থাকত। এখন তার ভয়ে ভীত না হয়ে দুবাহু বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করতাম, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতাম।

—দাদু আজ আমরা অনুতপ্ত।

—এখন অনুতাপ বৃথা। আমাদের মৃত্যুর বহুযুগ পরে লোকে যখন কালাচাঁদের কথা ভাববে তখন তারা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাদেরও ঘৃণা করা উচিত। তোমরাই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, আমাদের দেববিগ্রহ, মন্দির সব কিছু ধ্বংসের আসল কারণ—মহম্মদ ফারমূলি নয়। যেদিন ধর্মের নামে বজ্জাতি ঘুচবে, ভণ্ডামির অবসান হবে সেদিন আমাদের দেশ জাগবে।

—দাদু।

—তোমরা চলে যাও, আমি তোমাদের ঘৃণা করি।

—কালাচাঁদকে তোমরা পরিত্যাগ করেছ, আমি উপবীত ছিঁড়ে স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছি।

—দাদু-আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। পুরানো কথা তুলে আর গালিগালাজ করবেন না। আমরা আপনার কাছে আশ্রয়প্রার্থী—আপনি আমাদের বাঁচান।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বেশ তাই হবে। আমি কালাচাঁদের আক্রমণ প্রতিহত করব।

তোমাদের কথা ভেবে নয়—ভাদুড়িয়ার কথা ভেবে আমি তাকে রুখব।

লজ্জায় মাথা হেঁট করে পুরোহিতেরা চলে গেলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রূপালী ও রূপাণীকে নিয়ে রাজা সমরজিতের প্রাসাদে গেলেন। জ্ঞানেন্দ্র-নাথকে দেখেই রাজা বললেন, পিতামহ আপনি আমাদের বাঁচান।

—হ্যাঁ সে জন্যই এসেছি।

রাজা উদগ্রীব হলেন।

—একটা উপায়ের কথা আমি ভেবেছি।

—বলুন কি উপায়। মহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমার নেই।

—সে আমি জানি। সেজন্যেই আমি একটা অন্য পরিকল্পনা করেছি। কালাচাঁদকে খবর পাঠান যে আপনি আমাদের গৃহবন্দী করেছেন। মুসলমান সৈন্য শহরে ঢুকলেই আপনি আমাদের হত্যা করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সংবাদ পেলে কালাচাঁদ ফিরে যাবে। সে আমাকে ও রূপালীকে গভীর-ভাবে ভালবাসে।

মুস্কিল আসান হয়ে গেল। রাজা তৎক্ষণাৎ দূত পাঠালেন। সীমান্তে রাজদূতের সঙ্গে মহম্মদের সাক্ষাৎ হল। মহম্মদ সংবাদ শুনলেন।

—কি, আমার দাদু ও স্ত্রীদের গৃহবন্দী! এতো সাহস বুড়ো রাজার! চিৎকার করে উঠল মহম্মদ।

—আমি বুড়ো ভামকে উচিত শিক্ষা দেবো। আমার দাদুকে বন্দী! আমার স্ত্রীর গায়ে হাত! কুকুরের মত টুকরো টুকরো করে আমি রাজা সমরজিতকে হত্যা করব।

দূত সবিনয়ে বলল, জনাব, রাজা কিন্তু মরিয়া। আপনি রাজাকে অবশ্যই সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন কিন্তু কি তার মূল্য দিতে হবে ভেবে দেখেছেন? আপনি শহরে ঢোকা মাত্রই আপনার দুই ধর্মপত্নী ও দাদু নিহত হবেন।

চুপ করে গেল মহম্মদ। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো পাইচারী করতে লাগল। অক্ষম, শক্তিহীন রাজা তাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। এই সেই ভাদুড়িয়া। তার পূর্বপুরুষের বাস। এ তার মাতৃভূমি। আজও সেখানে তার দুই প্রিয়তমা স্ত্রী, তার দাদু দাদীমা বাস করে। কালাচাঁদের দুর্বল স্থানে

আঘাত এসেছে। না। অসম্ভব। মহম্মদ ভাতুড়িয়া আক্রমণ করবে না। মহম্মদ সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে চলে গেল। ভাতুড়িয়া আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেল।

* * * * *

পরবর্তী দু-বছরের ইতিহাস হত্যা, লুণ্ঠন আর অগ্নি সংযোগের ইতিহাস। রক্ত আর তরবারির ইতিহাস। ধ্বংস আর ধর্মান্তরকরণের ইতিহাস। একটার পর একটা হিন্দু শহর ও গ্রাম ধ্বংস করতে করতে মহম্মদ দিনাজপুরে এসে হাজির হল। কাপুরুষ রাজা আক্রমণের সংবাদ শুনেই লক্ষ্মণসেনের মত রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। নেটমহম্মদ একটার পর একটা মন্দির ধ্বংস করে চলল। বাঁহাত দিয়ে দেববিগ্রহ চূর্ণ করল। দলে দলে লোক মুসলমান হল। যারা অস্বীকার করল তারা নৃশংসভাবে নিহত হল। নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মহম্মদ পবিত্র তর্পণ ঘাটে এসে দাঁড়াল। কথিত আছে এই ঘাটে স্নান সেরে ঋষিকবি বাল্মীকি তর্পণ করেছিলেন। পরে তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

---চূর্ণ করে দাও তর্পণ ঘাট। মহম্মদ সৈন্যদের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠ।

তর্পণ ঘাট চূর্ণ হল।

হিন্দুর শেষ চিহ্ন ভারতবর্ষ থেকে মুছে দেবে মহম্মদ। এরপর মহম্মদ এগিয়ে চললো রংপুরের দিকে। সেখানে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি: হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ।

দেশের উপর দিয়ে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার হল। মরা মানুষের দুর্গন্ধে বায়ুমণ্ডলবিষাক্ত হয়ে উঠল।

এরপর কামরূপ। মহম্মদ বিনাবাধায় গৌহাটি পর্যন্ত চলে গেলো ঝড়ের গতিতে। শেষে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। শাক্তমন্দির, জাগ্রত দেবতা, এখানে প্রতিদিন শত শত পশুবলি হয়। তান্ত্রিক মতে আরাধনা হয়, যাগযজ্ঞ হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য থেকে তীর্থযাত্রীরা দেবীদর্শনে আসে।

—ভেঙ্গে দাও মন্দির।

এক পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করে উঠল মহম্মদ। লৌহমুদ্গর দিয়ে মন্দির চূর্ণ করা হল, তারপর মহম্মদ বাঁহাত দিয়ে বিগ্রহ চূর্ণ করল। একটার পর একটা পুরোহিতকে হত্যা করা হল। তীর্থযাত্রীদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হল। যারা অস্বীকার করল তাদের কাটা মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মহম্মদের মৃত্যুর ক্ষুধা তৃপ্ত হলে সে কোচ রাজ্যের দিকে সৈন্যবাহিনী ফেরাল। মহানন্দার পশ্চিমে এই কোচ রাজ্য। রাজধানী কোচবিহার।

কোচবিহারে তখন রাজত্ব করতেন রাজা নরনারায়ণ। রাজা নরনারায়ণ অতি দয়ালু ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। সারা রাজ্য ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যখন তিনি শুনলেন মহম্মদ ফারমূলী কোচবিহারের দিকে এগিয়ে আসছে তখন তিনি বুঝতে পারলেন বিশাল মুসলমান বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা অসম্ভব। তবুও তিনি তাঁর সামান্য সৈন্যদলকে সজ্জিত করতে লাগলেন।

মহম্মদের সৈন্যদল একটা কালো মেঘের মত এগিয়ে চলল। ভয়াল মৃত্যুর একট কালো মেঘ দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে।

মহম্মদ ফারমূলি সেনাবাহিনীর সম্মুখে একটা কালো আরবী ঘোড়ায় বসে সৈন্যচালনা করে। বহুদূর থেকে তার কালো পোষাক দেখে লোকে আতংকে শিউরে উঠত। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। কারো পরিত্রাণ নেই। এমনকি মন্দিরের দেবতাও রেহাই পাবে না। কালো আলখাল্লায় ঢাকা বিশাল চেহারার মহম্মদ ফারমূলি লোকের কল্পনায় এক চলমান কালোপাহাড় বলে মনে হত।

কালোপাহাড়।

মহম্মদ ফারমূলিকে লোকে নতুন নাম দিল।

কালো পাহাড়। তাই থেকে কালাপাহাড়।

কোচবিহার রাজ্যের সীমান্তে যুদ্ধ হল। যুদ্ধে নরনারায়ণ পরাজিত

হলেন। তিনি মহম্মদের সঙ্গে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু মহম্মদ রাজী হল না। কাফেরের সঙ্গে কোন কথা নয়। হিন্দুর সঙ্গে কোন চুক্তি নয়। রাজা নরনারায়ণ জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। একদিন এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎপেতে রইলেন।

যেখানেই মহম্মদ যায় সেখানেই আর্তনাদ ওঠে।

পালাও। কালাপাহাড় আসছে।

লুকোও। কালাপাহাড় আসছে।

মর। কালাপাহাড় তোমায় মুসলমান করবে।

কালাপাহাড় যেখানেই যায় সেখানেই তার প্রধান লক্ষ্যস্থল হল মন্দির ও পুরোহিত। সে প্রথমে মন্দির ধ্বংস করে তারপর পুরোহিতদের হত্যা করে। বলপূর্বক হিন্দুদের মুসলমান করা হয়। মহম্মদ ফারমুলির এক কথা, হয় মুসলমান হও, নয় মর। যারা মুসলমান হয় তারা প্রাণে বেঁচে যায় আর যারা ধর্মত্যাগে অস্বীকার করে, তারা মরে। কোন দয়া মায়া নেই। নির্দয়, নির্মম, নিষ্ঠুর। হিন্দু হত্যা করে এক পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করে মহম্মদ। রক্তের তৃষ্ণা তাকে পেয়ে বসেছে। রক্ত—আরও রক্ত। ভারতবর্ষের বুকে রক্তের নদী বইয়ে দেবে মহম্মদ। পৃথিবী থেকে মুছে যাবে হিন্দুর নাম। থাকবে না একটাও মন্দির। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পাণ্ডা পুরোহিতের দল।

এর নাম প্রতিহিংসা। এর নাম প্রতিশোধ। এরনাম আক্রোশ।

এমন কি সৈন্যরাও মহম্মদের জিঘাংসা দেখে ভীত হয়ে ওঠে। তার কার্যকলাপ দেখে শংকিত হয়। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে? তারা সৈনিক, সেনাপতির আদেশ পালন করতে বাধ্য কিন্তু মনে মনে তারা মহম্মদকে অপছন্দ করে। ঘৃণা করে। লোকটা মানুষ না পিশাচ?

সেই সময় প্রাণভয়ে ভীত হিন্দু নর-নারীরা কালাচাঁদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াত। মুসলমান সৈন্যরা তাদের তাঁবুতে হিন্দুদের লুকিয়ে রেখে তাদের প্রাণরক্ষা করে। নুরুল হাসান ধর্মান্তরিত করার আদেশ পেলে তদনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয় কিন্তু দরিদ্র, ক্ষুধার্ত এবং প্রাণভয়ে ভীত মানুষগুলোকে দেখে তার অন্তর বিদ্রোহ করে ওঠে।

সে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের পালাবার পথ করে দেয়।

পূর্বভারত কালাপাহাড়ের নামে কাঁপতে শুরু করল। কালাপাহাড় এক জীবন্ত বিভীষিকা। সে অবাধে ধ্বংস, লুণ্ঠন আর অত্যাচার চালিয়ে চলল।

*　　　*　　　*

—আব্বাজান, আপনি অপরকে হত্যা করে কি আনন্দ পান? খোদা কসম, আপনি মহম্মদকে থামান। আমি এসব ঘৃণা করি।

রাগে তুলারী সুলতানের কাছে এসে ফেটে পড়ল।

—বাছা, মহম্মদ এক সাচ্চা মুসলমান। সে তো কোন অন্যায় করছে না। সে আমার রাজ্য বাড়াচ্ছে, রাজকোষ সমৃদ্ধ করছে।

—তুমি আর অন্য কিছু ভাবতে পার না আব্বাজান? প্রজার মঙ্গলের কথা তুমি কি কখনও ভাবো না আব্বাজান? তাদের সুখদুঃখে তোমার কিছু আসে যায় না?

—একথা, বলছিস কেন মা?

—হিন্দুদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না আব্বাজান। ধর্মান্তরিত না হতে চাইলে মহম্মদ তাদের হত্যা করছে, আর ধর্মান্তরিত হলে তাদের ক্রীতদাস করা হচ্ছে।

—অবিশ্বাসী কাফেরকে মুসলমান করা পবিত্র কাজ। কিন্তু আমরা কাউকে ক্রীতদাস করি না।

—আব্বাজান, আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি মহম্মদকে থামান। লোকে বলে কালাপাহাড়। কি নাম! আমি কি একটা পিশাচকে বিয়ে করেছি? আমি কি একটা নরদানবকে ভালবেসেছি?

—তুলারী অবসন্ন হয়ে পড়ল। সহসা সুলতান লক্ষ্য করলেন তুলারীর চেহারায় পরিবর্তন হয়েছে। শরীর ভারী হয়েছে।

—তুলারী, তুমি কি মা পুত্রসম্ভবা?

—হ্যাঁ আব্বাজান। কিন্তু এ আমি ঘৃণা করি। একজন পিশাচের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে ঘৃণা করি। আমার লজ্জা করে।

—বাছা শান্ত হও। আমার মত এক বৃদ্ধের সঙ্গে এত বাদানুবাদের প্রয়োজন নেই। তোমার ঘরে যাও। শীঘ্রই মহম্মদ ফিরে আসবে, তার কাছেই তোমার উষ্মা প্রকাশ কর।

মহম্মদ তন্দায় ফিরে এসে বিপুল ও সতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা লাভ করল। রাজধানীতে আনন্দের স্রোত বহে গেল। সুলতান মহম্মদকে শ্রেষ্ঠ আমীরের সম্মানে ভূষিত করলেন। সাতদিন ধরে চলল আনন্দ উৎসব। বিজয়োল্লাস। বাজী পুড়ল। বাইজী নাচল। অবাধে খানাপিনা চলল।

মহম্মদ দুলারীর কক্ষে প্রবেশ করে দেখল সে পালংকে শুয়ে আছে। অসুস্থ. মহম্মদ দুলারীকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসে। দুলারীও একদা কালাচাঁদকে বাদ দিয়ে বেচেঁ থাকার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করেছিল। দুলারী ভালবেসেছিল কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ীকে। মহম্মদ ফর্মূলিকে নয়। কালাপাহাড়কে নয়। কালাপাহাড় দুলারীর কাছে অসহ্য। কালাচাঁদ কি মরে গেছে? তার সামনে যে এসে দাঁড়াল সে কি তার প্রেতাত্মা?

মহম্মদ ঘরে ঢুকলেও দুলারী শয্যা ছেড়ে উঠল না। কোন অভ্যর্থনা করল না।

—কয়েক দিন আগেও তো তুমি বহাল তবিয়তে ছিলে দুলারী? হঠাৎ তোমার কি হল?

মহম্মদের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল।

—আমি অসুস্থ। দুলারী মুখ ফিরিয়ে নিল।

—মনে হচ্ছে আমার আসায় তুমি খুশী হওনি?

—ঠিক তাই।

—তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার নৃশংসতায় আমার নারীমন আহত হয়েছে। তোমায় আমি বীর বলে জানতাম। কিন্তু এখন তুমি যা করছ সেটা কি বীরের কাজ না পিশাচের কাজ?

—রাজনীতি নিয়ে আমি তোমার, সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না দুলারী।

—দোহাই তোমার আমি সন্তানসম্ভবা। তোমার ঔরষজাত সন্তান

আমার গর্ভে। দয়া করে আমায় বিরক্ত না করে আমায় শান্তিতে থাকতে দাও। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর আমি তোমার সেবা করব।

মহম্মদের মনে হল দুলারী তার গালে একটা প্রচণ্ড চড় মারল। মনে হল এ মেয়েকে সে চেনে না।

—দুলারী আমি তোমার স্বামী—আমি কি কোন অপরিচিত আগন্তুক ?

—দয়া করে তুমি যাও। আমি অসুস্থ।

আস্তে আস্তে অপমানিত মহম্মদ দুলারীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে সে। তার আদেশে তার চোখের সামনে সৈন্যরা সতীনারীকে উলঙ্গ করে তাদের ধর্ষণ করেছে। তাদের আর্তকান্নায় তার হৃদয় এতটুকু কাঁপেনি। তার সামনে প্রতিবাদ করে কেউ বেঁচে থাকতে পারেনি। কিন্তু আজ সামান্য একটা নারী তাকে ঘর থেকে বারকরে দিল। বিশ্বজয় করে এসে শেষকালে নিজের গৃহে একি নির্মম পরাজয়।

অদৃষ্টের একী প্রহসন !

* * * * *

অবশেষে দুলারীর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হল।

মহম্মদ এসে কন্যাকে কোলে তুলে নিল।

—দুলারী আমি এর নাম দিলাম ফাতিমা। মহম্মদ দুলারীকে খুশী করতে চাইল।

কিন্তু দুলারীর দিক থেকে কোন উষ্ণ অভ্যর্থনা এল না। মহম্মদের মনে হল দুলারী যেন তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

দুলারী অস্ফুটস্বরে বলল, তাই হবে। এ শিশু আমাদের প্রেমের ফুল। কিন্তু তোমার ঔরষে আমি আর কোন সন্তান কামনা করি না।

—দুলারী তুমি আমার স্ত্রী।

—আমি মহম্মদ ফারমুলিকে বিয়ে করি নি—আমি কালাপাহাড়কেও বিয়ে করিনি। আমি বিয়ে করেছিলাম কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ীকে। আমি সেই হিন্দু ব্রাহ্মণ কালাচাঁদের স্ত্রী।

—দুলারী।

—বল কি বলবে ?

—ঔদ্ধত্যের সীমা আছে। সহ্যেরও শেষ আছে।

—কিন্তু তোমার পৈশাচিকতা দেখে আমার সহ্যের বাঁধ যে ভেঙ্গে গেছে স্বামিন।

—দুলারী আমি আবার বিয়ে করব।

—তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। তোমার হুমকিতে আমি ভয় পাই না। আজ আমি তোমায় ঘৃণা করি। তুমি আমার গায়ে হাত দিলে মনে হয় যেন একটা ময়াল সাপ আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি চাই না আমার এই ঘৃণা থেকে কোন সন্তানের জন্ম হোক।

—দুলারী আমি তোমায় ভালবাসি।

দুলারী কোন কথা বলল না।

—তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে আমি কোথায় যাব দুলারী ?

মহম্মদ দুলারীর হাত দুটো ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

—কেন তোমার পদতলে তো সারা পৃথিবী রয়েছে।

ব্যথায় মুহ্যমান মহম্মদ দুলারীর কোলে মাথা রাখল।

—তুমি কি সত্যই আমায় পরিত্যাগ করতে চাও দুলারী ?

—তুমি যদি হত্যা, লুণ্ঠন পরিত্যাগ করে আবার স্বাভাবিক মানুষ হও তাহলে আমি তোমায় মাথায় করে রাখব স্বামিন।

—তা আর হয় না দুলারী। আমাকে এখনও অনেক দেশ জয় করতে হবে—অনেক কাফের নিধন করতে হবে।

—তুমি কি করে আশা কর যে আমি একজন নিষ্ঠুর নরঘাতককে ভাল বাসব ? একজন লোক যে শুধু হত্যার জন্যেই হত্যা করে, ধ্বংসের জন্যেই ধ্বংস করে, ধর্মান্তর করণের জন্যে মানুষকে ধর্মান্তরিত করে তাকে আমি স্বামী বলে ভাবতে লজ্জা পাই।

—লজ্জা ?

—হ্যাঁ, লজ্জা।

—কিসের লজ্জা ? কেন লজ্জা ?

ধীরে ধীরে দুলারী বলল, আমি জানি আমিই এসবের মূল কারণ। আমি তোমার জীবনে না আসলে তুমি আজ হিন্দুই থাকতে। তোমার পত্নীদের নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে। আমাকে বিয়ে করে তুমি ধর্মচ্যুত হয়েছ। তারপর তুমি মুসলমান হয়েছ—প্রতিহিংসাপরায়ণ মুসলমান। এখন তুমি এক বিগ্রহচূর্ণকারী দানব—হিন্দু হত্যাকারী পিশাচ। আমি ভালোবেসেছি এক দেবতাকে—দানবকে নয়।

—দুলারী তুমি মুসলমান হয়েও হিন্দুদের মত কথা বলছ।

—আমি মানুষের মতো কথা বলছি।

—তুমি হিন্দুদের ভালবাস? বিস্ময়ে অভিভূত মহম্মদ।

—ভুলে যেও না, আমি যাকে ভালবেসেছিলাম সে হিন্দু ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী। হিন্দুরা কি মানুষ নয়? হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিসের পার্থক্য? কিসের পার্থক্য মানুষে মানুষে? সূর্য কি শুধু মুসলমানদের আলো দেয়? মহানন্দা কি মুসলমানের কাছে মিষ্টি আর হিন্দুর কাছে তেতো? জরাব্যাধি কি শুধু হিন্দুর জন্যে? মুসলমানকে কি তারা ছেড়ে দেয়? আগুন কি শুধু হিন্দুকেই পোড়ায়? স্বামীর ধর্ম যদি স্ত্রীর ধর্ম হয় তবে আমিও হিন্দু। তুমিও তো একদিন হিন্দু ছিলে। শুধু কি মুসলমানের মধ্যে দয়া মায়া, প্রেম মহত্ব আছে? তোমার পিতামাতার কথা ভাব। তাঁরা কত মহৎ, কত উদার।

—দুলারী

—তুমি আর এখন মানুষ নও—শুধু কালাপাহাড়। যে হিন্দু ব্রাহ্মণ কালাচাঁদকে আমি ভালবেসেছিলাম, সে মরে গেছে—কালাপাহাড় হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রেতাত্মা।

—মিথ্যা বলনি দুলারী।

—দুলারী মিথ্যা বলে না। এখন তুমি শুধু নিষ্ঠুরতা, রক্ত, ঘৃণা আর মৃত্যু।

—দুলারী তুমি থামবে?

—তুমি কি জান না কালাপাহাড় তোমার নাম শুনলে ঘুমন্ত শিশুও

আতংকে চিৎকার করেওঠে ? তুমি কি জান না তোমার নাম শুনলে মেয়েরা ডুকরে কেঁদে ওঠে ? তুমি কি জান না তোমার হুংকার শুনলে পুরুষেরা জঙ্গলে পালিয়ে যায় ? তুমি একটা জীবন্ত আতংক—তুমি একটা সাক্ষাৎ কালো মৃত্যু। তোমার নাম সার্থক কালাপাহাড়।

—তুমি আর আমায় ভালবাস না দুলারী।

—আশ্চর্য, এখনো ভালবাসার কথা ? তোমার আমার মধ্যে ভালবাসার অবকাশ কোথায় ? কালাচাঁদ না চাইতেই দুলারীর ভালবাসা পেয়েছিল। নিজেকে নিঃস্ব কবে বিলিয়ে দেওয়া ভালবাসা—সে স্বর্গের ভালবাসা—বেহেস্তের দান। আর আজ কালাপাহাড়কে নতজানু হয়ে ভালবাসা ভিক্ষা করতে হচ্ছে। আশ্চর্য গ্রহের ফের। কিয়া তাজ্জব।

—আমি তোমার ভালবাসা ভিক্ষাই করছি আজ দুলারী।

—ভালবাসা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না। আজ যে দুলারীকে তোমার সামনে দেখছ সে শুধু একটা রক্ত মাংসের দেহ—একদিন এই দেহ শুকিয়ে ঝরে যাবে। কিন্তু যে ভালবাসতে পারে, যে দিতে পারবে ভালবাসা সে আমার আত্মা। সে যে মরে গেছে কালাপাহাড়।

উঠে দাঁড়াল মহম্মদ। তার চোখে সব হারানোর বেদনা। এই মুহূর্তে সে অনুভব করল, সে একাকী, নিঃসঙ্গ, নিরবলম্ব। একদিন এমন ভাবেই সে পুরীর পথে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পাপস্খালনের জন্যে ছুটে গিয়েছিল। নারীর অভাব নেই। কিন্তু নারী নয়—দুলারী। দুলারীকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা মহম্মদের কাছে অর্থহীন। জীবন অর্থহীন। মহম্মদ মাতালের মত টলতে টলতে দুলারীর সামনে থেকে বেরিয়ে গেল।

সুলতানকে সে সব কথা বলল। সুলতান দুঃখ পেলেন। মহম্মদ বলল, জাহাঁপনা, এখন আমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। আমি এখান থেকে দিল্লী চলে যাব। সেখানে সম্রাট আকবরের সৈন্যদলে যোগদান করব। নতুবা আপনার সৈন্যদল নিয়ে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হব। কি করব আপনিই বলুন।

—মহম্মদ আমি তোমায় ভালবাসি—তুমি আমায় পরিত্যাগ কোরে

যেওনা। আমি বৃদ্ধ, আমার ছেলেরা নাবালক, এখন তুমি চলে গেলে আমি যে অসহায় হয়ে পড়ব। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, সৈন্যদল তোমার।

—আমি জৌনপুর অভিযান করব। সুলতান বারবাক শাহ অত্যন্ত উদ্ধত এবং অহংকারী। তাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—ইনসা আল্লা, তুমি বেরিয়ে পড়।

মহম্মদ ফারমুলি সৈন্যবাহিনী নিয়ে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো।

জৌনপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে সুলতান বারবাক শাহ কালাপাহাড়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সে কালাপাহাড়ের নাম শুনেছে। তার বিজয় অভিযানের কাহিনী জেনেছে। যুদ্ধ করতে হলে এমন বীরপুরুষের সঙ্গেই তো যুদ্ধ করা দরকার। তাছাড়া কালাচাঁদকে পরাজিত করতে পারলে বাংলা ও উড়িষ্যার মসনদ তার হবে। তার তরবারি কালো মৃত্যুকে জানিয়ে দেবে মৃত্যুরও মৃত্যু আছে।

কিন্তু চাকা ঘুরে গেল। মহম্মদের হাতে নিদারুণভাবে পরাজিত হল সুলতান বারবাক শাহ। পরাজিত হয়ে তিনি জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

* * *

কালাপাহাড় নিদারুণভাবে নিঃসঙ্গ। তার জীবনে যে তিনজন প্রেমিকানারী এসেছিল তারা সব সরে গেছে। রূপালীর অশ্রুসজল ছল-ছল চোখ দুটো মনে পড়লে কালাপাহাড় এক অব্যক্ত বেদনায় ছটফট করে ওঠে। দুলারীর দুঃসাহসী প্রেমের কথা ভাবলে নতুন করে বাঁচার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেই সব নারীরা আজ কোথায় আর কালাপাহাড় কোথায়। কোথায় তার দাদু জ্ঞানেন্দ্রনাথ যে তাকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে বড় করে তুলেছিল তার পিতার মৃত্যুর পর? কোথায় তার দাদীমা? কোথায় সব হারিয়ে গেল? নিশুতিরাত্রে সারা পৃথিবী যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন তখন কালাপাহাড় নিঃশব্দে তাঁবুর বাহিরে এসেছে আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে

বসে থাকে। সম্বিৎ ফেরে, যখন দেখে সকাল হয়ে গেছে।

কালাপাহাড় দারুণ অসুস্থ। সদাই বিমর্ষ। হারানো দিনের কথাগুলো স্বপ্নের মত মনে হয়। আঠারো বছর বয়সে ভাদুড়িয়ায় রূপালী ও রূপানীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। সেদিন তারা ছিল তার কাছে সমস্ত পৃথিবী। তারপর তার জীবনে ধূমকেতুর মতো অকস্মাৎ এলো রাজকন্যা দুলারী। তার ভালবাসায় তার সমস্ত সত্তা ডুবে গেল। কিন্তু সে তাকে দূরে ঠেলে দিল। দুলারী যা চায় তা হয় না। প্রতিহিংসার লালসা থেকে কালাপাহাড়কে পৃথিবীর কোন শক্তি নিবৃত্ত করতে পারবে না। হিন্দু দেখলেই তার প্রতিশোধ বাসনা জেগে ওঠে। পুরোহিত দেখলেই ক্রোধে তার শরীর রক্তবর্ণ হয়ে যায়। মন্দির দেখলেই তার মনে পড়ে যায় পুরীর পাণ্ডাদের ভণ্ডামী। কালাপাহাড় নিজের সৃষ্ট ঘৃণার জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছে।

কয়েকদিন পরে কালাপাহাড় নুরুল হাসানকে ডেকে পাঠাল। ফৌজদার আসতেই কালাপাহাড় বলল।

—এবার আমরা বারানসীর দিকে যাব ফৌজদার।

—যথা আজ্ঞা।

বিশাল সৈন্যদল নিয়ে মহম্মদ বারানসীর দ্বারে এসে উপস্থিত হল। বরুণা ও অসিনদীর মিলনস্থান তাই তার নাম বারানসী। স্বর্গে পৌছানোর সিঁড়ি। কালাপাহাড়ের অভিযানের কথা শুনে কাশীরাজ বিজয় সিং বারানসী ছেড়ে প্রাণভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। বিজয় সিংহ কাপুরুষ, দুশ্চরিত্র এক সুরাপায়ী। একদিন তারই বংশধর চৈৎ সিং ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করেছিল।

বিজয় সিং ছিলেন অপদার্থ রাজা। বিনা যুদ্ধে বারানসী কালাপাহাড়ের পদানত হল।

প্রতিহিংসা ও আক্রোশের একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। কালাপাহাড়ের সৈন্যরা যথেচ্ছ নরহত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন ও ধর্মান্তরকরণ করতে লাগল। মেয়েদের ধর্ষণ করা হল, সতীত্ব নাশ করা হল, পুরুষদের

উলঙ্গ করে চাবকানো হল, ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করলে কুকুরের মত হত্যা করা হল। কাশীনগরের একটার পর একটা মন্দির ধ্বংস করা হল, দেববিগ্রহ কালাপাহাড় নিজের বাঁহাত দিয়ে চূর্ণ করে ধূলায় ফেলে দিল। কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির স্পর্শ করল না। এরপর সারা শহরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। বারানসীর রাজপথ নররক্তে লাল হোয়ে গেল। গঙ্গায় মৃতদেহের স্রোত বয়ে গেল। কাশীর ধ্বংস সম্পূর্ণ হলে কালাপাহাড়ের হননের লিপ্সা কিছুটা তৃপ্ত হল।

তাঁবুতে বসে কালাপাহাড় বার্তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। প্রতি দণ্ডে দণ্ডে দূতেরা এসে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছে।

—চার হাজার লোক হত্যা করা হয়েছে, একহাজার ধর্মান্তরিত করা হয়েছে জনাব।

একজন দূত সংবাদ নিয়ে এল।

—উত্তম।

—তিন হাজার নরনারী হত্যা করা হয়েছে, দুহাজার ধর্মান্তরিত হয়েছে।

আর একজন দূত এসে খবর দিল।

—অতি উত্তম। দেখবে যেন কেউ যেন বিশ্বনাথের মন্দির স্পর্শ করে না। কালাপাহাড় সৈন্যদের সতর্ক করে দিল।

কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা থেকে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল বিশ্বনাথের মন্দির।

কেউ জানে না কেন কালাপাহাড়ের এই দুর্বলতা। বিশ্বনাথের মন্দিরের তিনি কোন ক্ষতি করতে চায় না কালাপাহাড়। কালাপাহাড়ের মনে পড়ে যায় শৈশবের কথা। তার একবার কঠিন পীড়া হয়েছিল। সবাই তার জীবনের আশা পরিত্যাগ করল। বৈদ্যরা আশা ছেড়ে দিল। তার দাদু এক স্বপ্নাদেশ পেলেন। কাশীধাম গিয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা দিলে রাজুর রোগমুক্তি ঘটবে। পরদিন সকালেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ পদব্রজে বারনসীর পথে যাত্রা করলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি বারানসী গিয়ে

পৌঁছলেন। যথা সময়ে বিশ্বনাথের চরণামৃত নিয়ে এলেন। আশ্চর্যভাবে রাজুর রোগমুক্তি ঘটল।

কালাপাহাড়ের দুর্বলতা আছে শুধু বিশ্বনাথের মন্দির সম্পর্কে। তাই সমগ্র বারানসী ধ্বংস হলেও এ মন্দির ধ্বংস হল না। অপবিত্র হল না। কেউ এই মন্দির স্পর্শ করল না

ফৌজদার নুরুল হাসান সৈনাধ্যক্ষ মহম্মদকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আজও তিনি এই মানুষটিকে বুঝতে পারেন নি। নির্বিচারে নরহত্যা করে এ লোকটা কি আনন্দ পায়? অবলা স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার করে কি উল্লাস পায়?

—আপনি বড় নির্দয় জনাব।

—শুধু নির্দয় বলছেন কেন ফৌজদার? বলুন লুটেরা—বলুন দস্যু—বলুন পিশাচ সেটাই ঠিক বলা হবে।

—আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন জনাব।

—অহেতুক? আমার এই পৈশাচিক কাজের পেছনে কোন হেতু নেই—কোন কারণ নেই, একথা তুমি বলতে চাও? তুমি জান না—আছে, কারণ আছে, নুরুল।

—বলুন জনাব।

—একদিন যারা আমায় লাথি মেরে দূরে ঠেলে দিয়েছিল তাদের ওপর আমি কি বদলা নেব না? তাদের কি আমি ছেড়ে দেবো? যারা আমায় মুসলমান করেছে তাদের আমি ছেড়ে দেবো? না—আমি কাউকে রেহাই দেবো না! এমনকি দেবতাকেও নয়।

আমি যতদিন বেঁচে থাকব ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম বলে কিছু থাকবে না—সবাই আমার মত মুসলমান হবে। আমি পৃথিবীর বুক থেকে হিন্দুধর্মকে মুছে দেবো—নিশ্চিহ্ন করে দেবো একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ জাতকে। আমি পুরীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে শপথ করেছি নুরুল।

* * *

নগরে অবাধ লুঠতরাজ চলছে। সৈন্যদের ব্যাভিচার আর উল্লাসের শব্দে

আকাশ দিগন্ত বিদীর্ণ। তাঁবুতে বসে আছে কালাপাহাড়। সামনে পানপাত্র। সহসা তাঁবুর বাইরে সোরগোল শোনা গেল। একজন প্রায় বৃদ্ধা কালাপাহাড়ের তাঁবুতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। চুল এলোমেলো, কাপড় ছিন্নভিন্ন, রক্তমাখা; অর্ধনগ্ন। স্ত্রীলোকটির বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে কিন্তু তার শরীরে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন দেখে বোঝা গেল সেও সৈন্যদের পৈশাচিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাইনি। সারা শরীরে বলাৎকারের চিহ্ন।

প্রহরীরা কিছুতেই বৃদ্ধাকে কালাপাহাড়ের তাঁবুতে ঢুকতে দেবে না আর সেও ছাড়বে না। ঢুকবেই। নাছোড়বান্দা। এর ফলে শোরগোল ও ধস্তাধস্তি। গোলমালের শব্দ শুনে কালাপাহাড় তাঁবুর বাইরে এসে বৃদ্ধাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

কালাপাহাড়ের সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। সে শুধু বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইল।

চিৎকার করে উঠল বৃদ্ধা

—কালাপাহাড়! কালাপাহাড়! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ! আমার মত এক বৃদ্ধাকে তোর নেকড়ের দল কি করেছে। আমি হিন্দু বলে এই জানোয়ারগুলি কি করেছে চেয়ে দেখ।

কালাপাহাড় নির্বাক। বিদ্যুৎপৃষ্টের মত অসাড়। বজ্রাহত। তার মুখটা কুষ্ঠরোগীর মত হঠাৎ ভাবলেশহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

—তুই কি আমায় চিনতে পারছিস না কালাপাহাড়? আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। শয়তানের বাচ্চা আমার দিকে তাকা।

তবুও একটা কথা বলতে পারল না কালাপাহাড়। নিস্পন্দ, নির্বাক, বজ্রাহত। অনেকক্ষণ পরে তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা জল পড়ল। তারপর বন্যার মত চোখের জলের প্রবাহ নামল।

কালাপাহাড় কাঁদছে। জীবনে কালাপাহাড় প্রথম কাঁদল।

—দাদীমা!

—কালাপাহাড় চিনতে পেরেছিস তোর দাদীমাকে ? আজ আর আমি তোর দাদীমা নই—আজ আমি এক ধর্ষিতা নারী। আমার দিকে চেয়ে দেখ, তোর কুত্তার দল আমার কি সর্বনাশ করেছে।

—দাদীমা।

কালাপাহাড় ইন্দুবালা দেবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

—কালাপাহাড় তুই যে পাপ করেছিস তোকে জন্ম জন্ম ধরে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সাধারণ মানুষের মৃত্যু তোর হবে না। তুই যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে মরবি। তোকে সবাই ঘৃণা করবে, ত্যাগ করবে—তুই এক নিঃসঙ্গ ঘেয়ো কুকুরের মত আঁস্তাকুড়ে পচে মরবি। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুই হাজার বছর ধরে নরকযন্ত্রণা ভোগ কর।

—দাদীমা।

—কালাপাহাড় এখনো তুই তোর ঘৃণ্য কাজের চরম রূপ দেখিসনি। তুই আয় আমার সঙ্গে—দেখে যা তোর কুকুরগুলো কি করেছে।

বৃদ্ধা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললেন। বিস্মিত, বিগলিত, অনুতপ্ত, বজ্রাহত কালাপাহাড় দাদীমাকে অনুসরণ করে কিছুদূরে এগিয়ে এসে বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে উঠল।

দেখল এক যুবতী উপুড় হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে।

কে ? কে এই ধর্ষিতা, ভূলুণ্ঠিতা, রক্তাক্তদেহী নারী ?

—কে ? কে ?

চিৎকার করে উঠল কালাপাহাড়।

—এখনও চিনতে পারলি না পিশাচ ? তোর স্ত্রী রূপালী।

—রূপালী—রূপালী—

কালাপাহাড় আছড়ে পড়ল নারী দেহের উপর। মুখটা তুলতেই দেখল একটা কুসুম পেলব ঘুমন্ত মুখ। এ ঘুম আর কোনদিন ভাঙ্গবে না।

—দেখছিস কি ? ও মরে গেছে। তোর কুকুরগুলো ওর ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওকে মেরে ফেলেছে।

—হা ভগবান! একি হল! রূপালী একবার চোখ তুলে দেখ—আমি কালাচাঁদ—তোমার স্বামী—

মৃতদেহ এতটুকু নড়ল না।

কালাপাহাড় আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দাদীমার দিকে তাকাল। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত ও ফেনা বার হচ্ছে। দু একটি অস্ফুট শব্দ শোনা গেল। তারপর তাঁর দেহটা ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। নিথর, নিস্পন্দ দেহ। সব শেষ।

কালাপাহাড় দুটি নারীর মৃতদেহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বজ্রাহত এক পাষাণ মূর্তি। একদিকে তার দাদীমা। অন্যদিকে তার প্রিয় পত্নী। একদিকে মাতৃমূর্তি অন্যদিকে বাসনামূর্তি। কালাপাহাড়ের চোখের জল ঝরে ঝরে সব শুকিয়ে গেছে। কাঁদবার মত শক্তি তার নেই।

ফৌজদার নুরুল হাসান ঝুঁকে পড়ে ইন্দুবালা দেবীকে পরীক্ষা করে বললেন, জনাব, এই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে বৃদ্ধা বিষ পান করেছে।

কালাপাহাড় দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়ল। অনেক চিত্র একটার পর একটা কালাপাহাড়ের মানসপটে ভেসে উঠল। আজ তার অনুশোচনার অন্ত নেই। শেষ নেই এ বিষাদ সিন্ধুর। আত্মগ্লানিতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল কালাপাহাড়। তার প্রিয়জনকে সে হত্যা করেছে। এই কি সে কোনদিন চেয়েছিল? তার কাজের পরিণতি যে এই হতে পারে একথা সে কি কোনদিন ভেবেছিল? তার বিষময় প্রতিহিংসা তার নিজের পরিবারের সতীত্ব নাশ করেছে।—এর পরও বেঁচে থাকা? এর পরও প্রাণ রাখা? আজ প্রথম কালাচাঁদের মনে হল সে একটা নরাধম। সে একটা পশু।

—নুরুল হাসান আপনি সৈন্যদের তাঁবুতে ফিরে যেতে আদেশ করুন—এই মুহূর্তে—

নুরুল হাসান কালাপাহাড়ের আদেশ শুনে খুশী হলেন। তবে কি মহম্মদের মধ্যে আবার মনুষ্যত্ব ফিরে এল? তিনি তৎক্ষণাৎ দূত মারফৎ কালাপাহাড়ের আদেশ সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন। এই ধ্বংস ও মৃত্যু তাঁর

কোনদিনই ভালো লাগেনি। কিন্তু সেনাপতির আদেশ অমান্য করা মানে রাজদ্রোহ। তাই সে প্রতিবাদ করতেসাহস করে নি।

মৃত্যুর উল্লাস থামল। আগুন নিভল। পালিয়ে যাওয়া নাগরিকেরা ভয়ে ভয়ে বারানসীতে ফিরে আসতে লাগল।

কালাপাহাড় সেই যে তাঁবুতে ঢুকল আর বার হল না। তাঁবুর মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখল। তাঁবুর ভিতরে সবার প্রবেশ নিষেধ। এমন কি নুরুলেরও নয়। একা একা কালাপাহাড় কি করে কেউ জানে না। কালাপাহাড় অন্নজল ত্যাগ করল। মেঝের ওপর পড়ে সে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল। যন্ত্রনায় কাতরাতে লাগল।

নুরুল দু একবার তাঁবুর ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছে। কালাপাহাড় মাথা নিচু করে উবু হয়ে পড়ে আছে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জনাব কি অসুস্থ ? কিন্তু কড়া হুকুম। প্রবেশ নিষেধ। এখন যদি সে তাঁবুর ভেতরে ঢোকে তাহলে মহম্মদ তাকে আস্ত রাখবে না। নিশ্চিত মৃত্যু।

সাত দিন সাত রাত কালাপাহাড় মাটিতে পড়ে রইল। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই। নবম দিবসে তাঁবুর ভেতর থেকে কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। নুরুলের সন্দেহ হল। সে দু একবার সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাকলেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। তার সন্দেহটা বদ্ধমূল হল। তবে কি কালাপাহাড় আত্মহত্যা করল ? অনুমতির অপেক্ষা না করে নুরুল সরাসরি কালাপাহাড়ের তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন।

তাঁবু ফাঁকা। কেউ নেই।

নুরুল হাসান ছুটে বাইরে এলেন। তাঁবুর চারপাশ খুঁজলেন। কিন্তু কোথাও কালাপাহাড়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। রক্ষীদের সামনে দিয়ে কিভাবে কখন কালাপাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল সেই গভীর রহস্যের হদিস নুরুল খুঁজে পেলেন না।

টেবিলের ওপর একটা চিঠি পড়ে রয়েছে। ওপরে লেখা রয়েছে 'দুলারী রায় ভাদুড়ী।' তার পাশে একটা ছোট চিরকুটে নুরুল হাসানকে লেখা দুটি কথা : ফৌজদার, অনুগ্রহ করে পত্রটা আমার স্ত্রী দুলারীকে

পৌঁছে দেবেন। আমি চললাম; আমার কোন খোঁজ করবেন না।

ফৌজদার নুরুল হাসান সেনাবাহিনী নিয়ে তন্দায় ফিরে এসে সুলতানকে সব কথা বললেন। কালাপাহাড়ের চিঠিটা দুলারীকে পাঠিয়ে দিলেন।

দুলারী চিঠিটা খুলল।

'দুলারী আজ আর আমি তোমার প্রতি কোন সোহাগের ভাষা ব্যবহার করছি না কারণ আমি ভুলে গেছি প্রেম কাকে বলে। ভুলে গেছি ভালবাসা কার নাম। আমি শুধু রক্ত তরবারি আর আগুন নিয়ে খেলা করেছি। আজ আমি সবার কাছে ঘৃণ্য আর পদাঘাতের পাত্র। ঈশ্বরের কাছে জঘন্য অপরাধী। আত্মগ্লানি আর আত্মধিক্কারে আমি অহরহ জ্বলছি। আমি আমার ভালবাসাকে নিজের হাতে ধ্বংস করেছি। আমার প্রেমকে হত্যা করেছি। নিঃশব্দে, রাতের অন্ধকারে, সৈন্যদের অগোচরে চোরের মত চুপি চুপি কাশী ত্যাগ করে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি? জানি না। শুধু জানি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অবিরত আমি লক্ষ লক্ষ প্রেত পিশাচের হুংকার শুনতে পাচ্ছি। তারা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আজও যদি তোমার কাছে আমার অস্তিত্বের কোন মূল্য থাকে, আজও যদি কোন বর্ষণমুখর বিষণ্ণ রাতে আমার কথা তোমার মনে পড়ে, তাহলে আমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে দোহা কোর, দু ফোঁটা চোখের জল ফেল।

দুলারী আমি এই রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে চলে যাচ্ছি—পালিয়ে যাচ্ছি—কোথায় যাচ্ছি জানি না। তবে শেষ কথা বলে যাই আমার নাম কালাপাহাড় নয়—আমার নাম কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী, আমি সেই ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায়—আমি সেই ভাগ্যবান পুরুষ যাকে তুমি নিজের জীবন তুচ্ছ করে একদিন ভালবেসেছিলে। বারানসী ধামে এসে দাদীমা আর রূপালীর বীভৎস মৃত্যু দেখার সঙ্গে সঙ্গে কালাপাহাড়েরও মৃত্যু হয়েছে। কালাপাহাড় মরে বেঁচেছে। তুমি আর আমায় ঘৃণা কর না দুলারী, আমি পাপের পথ, নরহত্যার পথ ছেড়ে দিয়েছি। আমার দুঃখ আমি আর তোমায় দেখতে পাব না—রূপালীকে দেখতে পাব না—দাদীমাকে দেখতে পাব না। আমি

যে মহাপাপ করেছি তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি অনুতাপ করে যাব। তীর্থ দর্শন করে আর হিমালয়ে গিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

আমার শেষ অনুরোধ আমাদের ভালবাসার কন্যা ফাতীমাকে আদরযত্ন করে মানুষ কর। বিবাহযোগ্যা হলে কোন সৎ মুসলমান ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিও। কোনদিন যেন ও কোন হিন্দু ছেলের প্রেমে না পড়ে। আমি চাইনা আবার কোন কালাপাহাড় বাংলার মাটিতে জন্ম নিক। বিদায় দুলারী।'

চিঠি পড়ে দুলারীর দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামল। সে অবোধ শিশুর মত কেঁদে উঠল। গুলসান কিছুতেই তার কান্না থামাতে পারল না। বৃদ্ধ সুলতান ছুটে এলেন। কি বলে কন্যাকে সান্ত্বনা দেবেন? শুধু বললেন, কাঁদিস না মা, সবই খোদার ইচ্ছা।

ধীরে ধীরে দুলারীর চোখের জল শুকিয়ে গেল। আস্তে আস্তে দুলারী সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলল, আব্বাজান, আপনি দেখুন একজন মেয়ে দেশের কি সর্বনাশ করতে পারে। আমি একটার পর একটা দেশ ধ্বংস করেছি, দেবমন্দির লুঠ করেছি, হাজার হাজার নিরপরাধ নরনারী শিশুকে নির্বিচারে কুকুরের মত হত্যা করেছি। কালাচাঁদকে নয়—আমার স্বামীকে নয়—পৃথিবী দোষ দেবে, নিন্দা করবে আমাকে। আমার প্রেমের জন্য একটা হিন্দু মুসলমান হয়েছে—একটা মানুষ অমানুষ হয়েছে—একটা মেষ শাবক পাগলা কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে একটার পর একটা মানুষকে কামড়েছে। অপরাধ? তারা হিন্দু। আমি কালাচাঁদকে ভালো না বাসলে এসব কিছুই হোত না। আব্বাজান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাপী আজ আমি। আমার গুনাহের কোন শেষ নেই।

—এসব কথা তুই ভাছিস কেন মা?

সুলতান কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। অব্যক্ত বেদনায় মুহ্যমান দুলারী মুখ গুঁজে পড়ে রইল। উঠল না, নড়ল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুলতান ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির আবর্তনে দিন শেষ হল। অস্তায়মান সূর্য মহানন্দার জলকে রক্তিম করে পশ্চিম তীরে ঢলে পড়তেই সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নেমে এল। দুলারী ধীরে ধীরে উঠে এসে উদাস নেত্রে গবাক্ষ দিয়ে মহানন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। এখানেই তার প্রেমের জন্ম, এখানেই তার ঘৃণার উৎপত্তি। এখানেই সে বেঁচেছিল, এখানেই সে মরবে। এখানেই সৃষ্টি, এখানেই ধ্বংস। এখানেই অস্তি, এখানেই নাস্তি।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মত নিঃশব্দে সন্ধ্যা এলো। ম্লান বিধুর সন্ধ্যা। সন্ধ্যার অন্ধকাব গাঢ়তর হতে থাকল। মহানন্দার উপর ঘন কুয়াশার স্তর জমে জমে সব অস্পষ্ট ধূসর হয়ে গেল। দূরে নগরীর কলকোলাহল স্তিমিত হয়ে এলো। দুলারী পালংক থেকে উঠে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ সে আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবল। তারপর সিন্দুর কৌটা বার করে তা থেকে সিদুঁর নিয়ে নিজের সিঁথিতে সুন্দর করে লাগিয়ে দিল। পরিধেয় কাপড়টা খুলে একটা নতুন বেনারসী শাড়ী পরে বিড়বিড় করে বলল, আমার নাম দুলারী রায় ভাদুড়ী—আমি ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ীর তৃতীয়া স্ত্রী।

রাজপ্রাসাদ থেকে প্রহরীদের অলক্ষ্যে এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে মহানন্দার সতীঘাটের দিকে এগিয়ে এলো। নারী অবগুণ্ঠনবতী। মাথায় সতীত্বের সিন্দুর, পায়ে অলক্তরাগ। পরণে বেনারসী সাড়ী। দ্রুতপায়ে সে সতীঘাটে এসে দাঁড়াল। দূরে তালগাছের মাথা থেকে একটা কালপেঁচা বিকট চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। নারীমূর্তিটা ধীরে ধীরে জলের দিকে পা বাড়াল। এক পা। আর এক পা। তারপর আর এক পা। তারপর অতল জল। শীতল জল······তারপর শুধু অন্ধকার, কান্না, শুধু সীমাহীন বিরহের হাহাকার। একটা ফুটন্ত গোলাপ ভাসতে ভাসতে ডুবে গেল······।

মহানন্দার জলে কতকগুলি বুড়বুড়ি উঠে মিলিয়ে গেল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ। দুলারী হারিয়ে গেল মহানন্দায়। যে বয়সে কারো

বার্ধক্য আসে না, জরা আক্রমণ করে না, কামনা শিথিল হয় না সেই বয়সেই একটা জীবন্ত প্রাণ মিলিয়ে গেল নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে।

॥ আট ॥

দশ বছর কেটে গেছে। তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের খাড়াই পথ ধরে একটি লোক প্রাণপণে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। একটি মাত্র ছেঁড়া নেংটী ছাড়া তার শরীরে আর কোন আচ্ছাদন নেই। চারিদিকে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া বইছে। খানাখন্দে জল জমে গেছে। লোকটির পা নয় কিন্তু তার পায়ে একটি আঙ্গুলও নেই। সারা দেহে চামড়া ফেটেফেটে কালো রক্ত জমে আছে। এমন খাড়াই ও সংকীর্ণ পথ দিয়ে যারা যায় তাদের হাতে লাঠি থাকে। কিন্তু লোকটার পক্ষে লাঠিধরা সম্ভব নয়—তার হাতের একটা আঙ্গুলও আস্ত নেই—গলিত কুষ্ঠরোগে হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলি খসে গেছে। লোকটা খাড়াই পথ ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে কিন্তু বারবার গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু তবুও সে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ঘেঁসড়ে ঘেঁসড়ে কিছুদূর গিয়ে সে আর এগুতে পারল না। বসে পড়ল। বসে পড়লে তার চলবে না। তাকে আজ পৌছতেই হবে অমরনাথ মন্দির। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা রাত্রে জলধারা জমে জমে অমরনাথ লিঙ্গম তৈরী হবে। জীবনের সর্বপাপ যদি কেউ সেই দেবতার কাছে অকপটে স্বীকার করে তাহলে তার মুক্তি ঘটবে। মোক্ষলাভ হবে। মুক্তিপাগল একবগগা মানুষটা ক্রমাগত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সহসা দূর থেকে একটা ভাল্লুক ছুটে এসে লোকটার পা কামড়ে ধরল। পশুটাকে বাধা দেবার মত শক্তি লোকটার নেই। বন্য পশুটা তার একটা পায়ের তলার দিকটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। আর কিছু দূর গেলেই অমরনাথের মন্দির। মৃত্যুর আগে যেমন করেই হোক তাকে সেখানে পৌছাতে হবে। তুষারতীর্থ অমরনাথের পথে চলেছে কালাপাহাড়।

* * *

কাশীর তাবু থেকে বেদনা-বিদ্ধ ও অনুতপ্ত কালাপাহাড় অদৃশ্য হয়ে যায়।

গঙ্গার দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে মুসলমানী পোষাক জলে ফেলে দিয়ে দীর্ঘ এক যুগপরে গায়ত্রী মন্ত্র যপ করে। তীর্থদর্শনে পাপ দূর হয়, মন শুদ্ধ হয়, দেবতার কৃপালাভ করা যায়। ভক্তির মধ্যে দিয়েই আসে মুক্তি। কালাপাহাড় বারাণসী থেকে চলে গেল হরিদ্বার। সেখান থেকে হৃষীকেশ। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কালাপাহাড় হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াল। সাধুসঙ্গ করল। সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হলেই সে তার পূর্বপাপের কাহিনী বলত। অবশেষে কালাপাহাড় মরুতীর্থ পুস্করে গিয়ে এক দিব্যদর্শী ত্রিকালজ্ঞ সাধুর সন্ধান পেল। সাধু তাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, শ্রাবণী পূর্ণিমার রাত্রে সর্বপাপহর লিঙ্গরাজ অমরনাথের পায়ে পড়। তাতেই তোমার সব কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তোমার আত্মার শুদ্ধি হবে।

* * *

কালাপাহাড় চলেছে সেই অমরনাথের দুর্গম বন্ধুর পথে। অজানা পথ, অচেনা দেশ। সে জানে না আর কতদূর। সে জানে না কোথায় পথের শেষ। পৃথিবীর কোন প্রতিকূল শক্তি আজ তাকে যোগভ্রষ্ট করতে পারবে না। সংকল্পে অনড় একটা বিকলাঙ্গ মানুষ।

ভাল্লুকের আক্রমণে কালাপাহাড়ের এক নতুন বিপদ দেখা দিল। ভাল্লুকটা তার পা কামড়ে তলার দিকটা কেটে নিল। মনে হচ্ছে এখানেই যন্ত্রণাবিদ্ধ কালাপাহাড়ের মৃত্যু হবে। কিন্তু অমরনাথের মন্দিরে পৌছানোর আগে কিছুতেই কালাপাহাড় মরবে না।

হঠাৎ দেখা গেল দূরে এক সৌম্যদর্শন অতিবৃদ্ধ চীবর সন্ন্যাসী লাঠি ধরে ধীরধীরে এগিয়ে আসছেন। বৃদ্ধ কাছে আসতেই ভাল্লুকটা পালিয়ে গেল।

—বাবা, তুমি আমায় বাঁচালে। কালাপাহাড় দেহে প্রাণ ফিরে পেল। বৃদ্ধ আকাশের দিকে তার লাঠিটা দেখিয়ে বলল, আমি নয়—ঈশ্বর।

—অমরনাথের মন্দির আর কতদূর বাবা?

—দুই ক্রোশপথ। তুমি কি মন্দিরে যাবে?

—হ্যাঁ বাবা আমি মন্দিরে যাবো। আজ যে শ্রাবণী পূর্ণিমা।

—আমি ও তো সেখানেই যাচ্ছি, কিন্তু এতটা পথ তুমি যাবে কি করে? তোমার একটা পা তো ভাল্লুক খেয়ে ফেলেছে দেখছি।

—তবু আমাকে যেতে হবে বাবা।

—মনে হচ্ছে তোমার শরীরে কুষ্ঠের ঘা।

—হ্যাঁ, বাবা।

—কি করে তোমার শরীরে এই গলিত কুষ্ঠরোগ এল? তুমি কি কোন পাপ করেছিলে বাছা?

—পাপ নয় বাবা, মহাপাপ—আমি মহাপাতক। মনে হচ্ছে আমি অমরনাথ পৌঁছাতে পারব না।

—তোমার শরীরের অবস্থা দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—বাবা, তুমি কি আমার হয়ে দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পার না? আমার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পার না?

—পারি বাছা।

—পার? তুমি কি দেবতার কাছে আমার প্রার্থনা শোনাতে পার বাবা? উত্তেজিত কালাপাহাড়ের শরীরে তড়িৎ প্রবাহ বহে গেল।

—কেন পারব না?

—তুমি আমাকে বাঁচালে—তুমি আমাকে মুক্তি দিলে। তুমি শুধু দেবতাকে বোলো কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী মুসলমান হতে চায়নি—পাণ্ডা পুরোহিতেরা তাকে মুসলমান হতে বাধ্য করেছিল—

—কি—কি বললে—কি নাম বললে— সোজা হয়ে দাঁড়াল ন্যুব্জদেহীবৃদ্ধ।

—কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী। আমি কালাচাঁদ রায় ভাদুড়ী। আমার উপর অত্যাচার করে পাণ্ডাপুরোহিতেরা আমায় মুসলমান হতে বাধ্য করেছিল। আমি কালাপাহাড় হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছি। প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের স্পৃহায় এক অশুভক্ষণে আমি উল্কার মত ভারতবর্ষের আকাশে জ্বলে উঠেছি—উল্কার মতই আমি জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছি। আমিই আমার দাদীমা আর রূপালীকে হত্যা করেছি। দুলারী আমায় ঘৃণা করে

দূরে সরে গেছে। আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি—

হঠাৎ কালাপাহাড় স্তব্ধ হয়ে গেল।

—কালাচাঁদ—তুই কালাচাঁদ, আমার রাজু—আমায় ভালো করে তাকিয়ে দেখ, আমি তোর দাদু—

কালাচাঁদের দেহ নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছে। তার পলকহীন চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে। কালাচাঁদের দেহে প্রাণ নেই। যাত্রা শেষ।

বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাষাণের মত স্থির, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখের জল কালাচাঁদের মাথায় ঝরে পড়ল।

কালাপাহাড়ের অমরনাথ দর্শন হল না।

* * * *

মহানন্দা গঙ্গায় এসে মিশেছে। গঙ্গা সাগরে এসে পড়েছে। মহানন্দার বিষন্ন বাতাসে কেঁদে মরে এক অশরীরী আত্মার অতৃপ্ত যৌবন। আজও বর্ষণমুখর নিশীথরাত্রে নিস্তরঙ্গ মহানন্দার তীরে তীরে এক অতৃপ্ত আত্মার নীরব কান্না গুমরে মরে। আজও অকস্মাৎ চন্দ্রালোকিত কুয়াশাচ্ছন্ন নিঝুমরাত্রে নিঃসঙ্গ পথিক এক ছায়াচ্ছন্ন অলৌকিক নারীমূর্তিকে মহানন্দার জলের উপর দিয়ে হেঁটে সতীঘাটে এসে বিলীন হয়ে যেতে দেখে।

এই সেই মহানন্দা। এই মহনন্দার তীরে একদা গড়ে উঠেছিল এমন এক আশ্চর্য মানুষের কাহিনী যে নিজেকে সৃষ্টি করে নিঃশেষে ধ্বংস করেছিল। স্বহস্তে নিজের হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলেছিল। এখানেই এক রূপসী রাজনন্দিনীর অমর প্রেমের মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। আবার এখানেই তার অশ্রুসজল সলিল সমাধি ঘটেছিল। মহানন্দার জল আর এক শোকাচ্ছন্ন ভাগ্যহত নারীর চোখের জল এক হয়েসাগরে মিশে গেছে। আজও গৌড়ের লোক বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় মহানন্দার বুকে দীপ জ্বেলেভাসিয়ে দেয়। হাজার হাজার দীপ জোনাকী চোখের মত ভাসতে ভাসতে কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে।

ইতিহাস বলে কালাপাহাড় এক ভয়াল, ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। কিম্বদন্তী

বলে কালাপাহাড় মহাদেবের রুদ্ররূপ। হিন্দুধর্মকে পাপ ও কলুষমুক্ত করার জন্যে, বকধার্মিকদের হাত থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যে স্বয়ং মহাদেব রুদ্ররূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কাশীর তাঁবু থেকে সবার অলক্ষ্যে কালাপাহাড় কেদারেশ্বর মন্দিরে চলে যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যেমন পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, কালাপাহাড়ও সেইরকম কেদাররেশ্বর বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলে সে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে গঙ্গাগর্ভে ডুব দেয় কিন্তু আর ওঠে নি। আবার কেউ তাকে হিমালয়ের দুর্গম পথ ধরে অমরনাথের দিকে চলে যেতে দেখেছিল।

মহানন্দা কালাচাঁদকে দেখেছে। ইতিহাস কালাপাহাড়ের কথা লিখেছে।